জাপানের দুই প্রসিদ্ধ লেখকের লেখা পুস্তক ইকিগাই এখন বিশ্বের ৫১টি ভাষায় প্রকাশিত, সর্বাধিক বিক্রিত এই পুস্তকটি এবার পড়ুন বাংলায়

ইকিগাই

দীর্ঘায়ু, সুস্থ এবং আনন্দে ভরা জীবন যাপনের জাপানি রহস্য

হেক্টর গার্সিয়া, ফ্রান্সিস মিরেলস

'এই বইটি আম আমার ভাই এটর-কে সমর্পিত করলাম, ওর মুখে সর্বদাই শোনা যায় 'আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী, সেটাই জানি না!'

- হেক্টর গার্সিয়া

'যে সমস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে সর্বক্ষণ প্রেরণা লাভ করেছি, যাঁরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে প্রেরণা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁদের-কেও এই পুস্তক সমর্পণ করলাম।'

- ফ্রান্সিস মিরেলস

'আপনি যখন জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত সক্রিয়তার সাথে অতিবাহিত করতে পারবেন, তখনই আপনার একশো বছর বাঁচার ইচ্ছা জাগবে।'

- জাপানি প্রবাদ

অনুক্রমণিকা

প্রস্তাবনা

'ইকিগাই' শব্দটির মধ্যে একটা জাদু আছে।

তখন সন্ধ্যার সময়, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, এই পুস্তকের দুই লেখক (আমরা দু'জন) প্রথমবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।বলা যায়, তখনই এই পুস্তকের বীজ বপন করা হয়েছিল।এর আগে আমরা বহুবার একে অপরের লেখা বিভিন্ন পুস্তক পড়েছি,কিন্তু এই প্রথম আমরা একে অপরের মুখোমুখি বসার সুযোগ পেয়েছিলাম।তখন আমার জাপানের রাজধানী থেকে হাজার মাইল দূরে ছিলাম, কিন্তু আমাদের দুজনের পছন্দের বিষয় একই ছিল। হয়তো সেই কারণেই তখন আমরা একে অপরের সাথে দেখা করেছিলাম।সেদিন আমাদের দেখা হয়েছিল বলেই এই পুস্তকের বীজ বপন করা সম্ভব হয়েছিল।ওই সাক্ষাতের এক বছর বাদে পুনরায় আমাদের দু'জনের দেখা হয়েছিল।বাগানে ঘোরার সময় আমার দু'জন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তবে আমরা বিশেষ করে 'লোক থেরাপি' নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যা মানুষকে নিজের জীবনের লক্ষ্য খুঁজে নিতে সাহায্য করে।আমাদের আলোচনার থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বর্তমান মনোচিকিৎসক ভিক্টর ফ্রাঙ্কল যে 'লোকথেরাপি'-র কথা বলেছিলেন, তার ব্যবহার খুবই কম করছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা কলেজের পাঠ্য পুস্তকে যা শিখেছেন, সেটাকেই প্রমাণ বলে মেনে নিচ্ছেন।কিন্তু আজও মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী, তা বুঝেই উঠতে পারেন না।কিন্তু আমি আজও প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করি, "আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?", "দীর্ঘায়ু লাভ করাই কি আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য?", "নাকি এর চেয়েও বড়ো কোনও উদ্দেশ্য আমার জীবনে আছে?"

কিছু লোক অবশ্য জানেন, তাঁদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী, আর তা প্রাপ্ত করাই তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে।অথচ বেশির ভাগ মানুষই দ্বিধার মধ্যে দিয়েই নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন, এমনটা কেন হয়? আমাদের আলোচনায় একটা কথা বারংবার আসছিল,আর সেই শব্দের মধ্যে একটা জাদু আছে, আর তাহল 'ইকিগাই'।এই শব্দের মধ্যে 'সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা' লুকিয়ে আছে, যা জাপানি ভাষায় ব্যবহার করা হয়।সাধারণ ভাবে বিচার করলে এই শব্দের অর্থ হল, "সর্বদা ব্যস্ত থাকার মধ্যে থেকে প্রাপ্ত আনন্দ।"লোকথেরাপি অনুসারে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই এর আনন্দ নিহিত আছে, কিন্তু এই শব্দের মধ্যে আরও গভীর কোনও অর্থ লুকিয়ে আছে।

'ইকগাই' এই চার অক্ষরের শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে, জাপানের মানুষদের দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির রহস্য।গবেষণার থেকে দেখা গেছে, জাপানে বসবাসকারী লোকরা অন্য দেশের লোকেদের থেকে অনেক বেশি বাঁচেন।অনেকেই বলেন ভালোমন্দ খাবার, গ্রিনটি, সুন্দর আবহাওয়া (হাওয়াই শহরের আবহাওয়ার মতো এখনকার আবহাওয়াও খুবই সুন্দর ও সুখকর)- এই দীর্ঘ জীবন লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।তবে এখানকার মানুষদের দীর্ঘায়ু লাভের পিছনে যে বিষয় বা শব্দটি সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে তাহল 'ইকিগাই'।এই শব্দ তাঁদের জীবনকে সঠিক পথ দেখতে সাহায্য করে।

এই বিষয়ে অধ্যয়ন করার সময় আমাদের একটা বিষয় মাথায় আসে, আর তাহল, আজ পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে কোনও পুস্তক লেখা হয়নি।সেই সাথে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসে, "ওকিনাওবামে বসবাসকারী লোকেরা জীবনের শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকার প্রেরণা কোথা থেকে লাভ করেন?" এই বিষয়টি মাথায় আসার পর, আমরা আরও গভীরে গিয়ে এর গবেষণা করার চেষ্টা করি, তখন দক্ষিণ জাপানের একটা গ্রাম সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, যার নাম ছিল ওমিগি। ওই ছোট্ট গ্রামে মাত্র তিন হাজার লোক বাস করতেন, সেই গ্রামে দীর্ঘায়ু লোকের অভাব ছিল না, ওই গ্রামটা তাঁদের জন্যই পরিচিতি লাভ করেছিল।

সেই গ্রামে একশো বছর বয়সের বহু মানুষ ছিলেন।আমরা ঠিক করি, কীভাবে এই বয়স তাঁরা লাভ করেছেন, আমরা অবশ্যই তা খুঁজে বার করবো।আর সেই অনুসারে আমরা প্রতিটা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিই।ওকিনাওয়া-তে লেবুজাতীয় একটা ছোট্ট ফল পাওয়া যায়, যার নাম 'শিকুবাসা', এন্টিঅক্সিডেন্ট ভরপুর এই ফলই কি তাঁদের দীর্ঘায়ু লাভের অন্যতম কারণ? চা বানানোর জন্য তাঁরা যে শুদ্ধ জলের ব্যবহার করতো, সেই জলই কি তাঁদের দীর্ঘ জীবন দান করেছে? গবেষণা শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণ দল ক্যামেরা নিয়ে সেই গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়।সেখানকরা লোকেদের ভাষা ছিল খুবই প্রাচীন এবং তাঁদের চুলও ছিল খুবই লম্বা।তাঁরা 'বুনাগয়া'-র মতানুসারে চলতেন।

সেই গ্রামে পা রাখার সাথে সাথে সেখানকার মানুষরা স্নেহের সাথে আমাদের স্বাগত জানান।তাঁদের সাথে একাত্ম হতে আমাদের খুব বেশি সময় লাগেনি, অতি সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে, এক বিশেষ উর্জার সাহায্যে তাঁদের জীবনের গতিপ্রকৃতি চালিত হচ্ছে।সেখানকার বয়জ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারি, প্রকৃতির আশীর্বাদ ছাড়াও সেখানে আরও কিছু ছিল, যা তাঁদের শতায়ু লাভের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।সেখানকার লোকেদের মধ্যে এক অদ্ভুত উর্জা ও জোশ লক্ষ্য করেছিলাম, যার দ্বারা তাঁরা আনন্দের সাথে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হন।তখন পুনরায় আমাদের সামনে 'ইকিগাই' শব্দটি আসে।তখন আমরা সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে 'ইকিগাই'-এর অর্থ কী, তা জানার চেষ্টা করি।এর প্রকৃত অর্থ কী এবং তার থেকে আমার কীভাবে লাভবান হতে পারি, সেটাও জানার চেষ্টা করতে থাকি।

সেই গ্রামের ইতিহাস জানতে গিয়ে, আমার জানতে পারি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানে হামলা হয়েছিল এবং তাতে দু'শো লোক প্রাণও হারায়।তাসত্ত্বেও ওই গ্রামের মানুষের মনে কোনও রকম প্রতিহিংসাত্মক ভাবনার জন্ম হয়নি, যা জেনে আমরা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।তাঁরা পজেটিভ চিন্তা ও 'ইচারিবোচোড'-এর ভিত্তিতেই জীবন অতিবাহিত করছিলেন।'ইচারিবোচোড'-এর অর্থ হল সকলের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ কর।যার সাথে আপনার জীবনে কোনও দিন দেখাই হয়নি, তারাও আপনার কাছে ভাইয়ের সমান।

সেই গ্রামের লোকেরা কীভাবে এমন আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করতেন, তার প্রথম ধাপ আমরা জানতে পেরে গিয়েছিলাম, আর তাহল তাঁদের সামাজিক জীবন।বহুদিন আগে থেকেই সেই গ্রামের বাসিন্দারা সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অতিবাহিত করার মন্ত্র শিখে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিল একাত্মবোধ।ওই গ্রামের লোকেরা একে অপরকে খুবই ভালোবাসতেন এবং সাহায্য করতেন। বন্ধুর মতো থাকা, হালকা খাবার খাওয়া, সঠিক মাত্রায় বিশ্রাম নেওয়া এবং নিয়মিত ব্যায়াম করাই ছিল তাঁদের সুস্থ জীবন যাপনের সঠিক মন্ত্র।কিন্তু এমন আনন্দজনক জীবন যাপনের পিছনে আসল যে কারণটি কাজ করেছে তাহল 'ইকিগাই'।তাঁরা জীবনের প্রতিটা দিন 'ইকিগাই'-কে সম্বল করেই বেঁচে আছেন।কীভাবে এই গ্রামের লোকেরা শতায়ু লাভ করতে সক্ষম হলেন এবং আপনি কীভাবে

'ইকিগাই'-এর সন্ধান করতে পারেন, সেটাই হল এই পুস্তক লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁরা 'ইকিগাই' লাভ করছেন, তাঁরা আনন্দে ভরা,সন্তুষ্টদায়ক দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন।জীবনে যে পথে আপনারা চলছেন, তার জন্য আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রইল শুভকামনা।

-হেক্টর গার্সিয়া এবং ফ্রান্সিস মিরেলস।

১.

ইকিগাই

বয়স বাড়ুক, কিন্তু তার ছাপ যেন আপনার উপর না পড়ে

আপনার অস্তিত্বের কারণ কী?

জাপানের মানুষরা মনে করেন, প্রতিটা মানুষের জীবনেই কোন না কোন 'ইকিগাই' থাকে।হয়তো ফ্রান্সের লোকেরা একে 'জীবনের উদ্দেশ্য' বলবেন, বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত।তবে প্রতিটা মানুষের মধ্যেই 'ইকিগাই' লুকিয়ে থাকে।কিছু মানুষ নিজের 'ইকিগাই' খুঁজে পান, তো কেউ তার সন্ধান চালিয়ে যান।

প্রত্যেকের ভেতরেই 'ইকিগাই' লুকিয়ে থাকে, তবে তা খোঁজার জন্য সংযমের প্রয়োজন।ওকিনাওয়া গ্রামের বাসিন্দাদের মতে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পিছনে একটাই কারণ কাজ করে, আর সেটা হল তাঁদের পাওয়া 'ইকিগাই'।

মার্ক উইনের তথ্যের ভিত্তিতে।

যায় করনা কেন, কখনই অলসের মতো বসে জীবন অতিবাহিত করনা।

একবার যদি আপনার কাছে নিজের 'ইকিগাই' স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত সুখ ও সন্তুষ্টি নিজের থেকেই আপনার কাছে ধরা দেবে;আপনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাবেন।এই পুস্তক পড়লেই এই বই লেখার মূল উদ্দেশ্য জানতে

পারবেন এবং সেই সাথে আপনি নিজের 'ইকিগাই'-ও খুঁজে পাবেন।জাপানের মানুষরা কীভাবে সুস্থ-সবল মনের সাহায্যে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হন, সেই রহস্যও জানতে পারবেন আপনি।

আপনি যদি জাপানে গিয়ে থাকেন, তাহলে একটা কথা অবশ্যই জানেন যে, অবসর গ্রহণের পরেও সেখানকার মানুষরা সক্রিয়তা ও ব্যস্ততার সাথেই জীবন অতিবাহিত করেন।

সত্যি বলতে কী, জাপানের মানুষরা অবসর কী তা জানেই না, কারণ সেখানে এমন কোনও শব্দই নেই।ইংরেজিতে 'রিটায়রমেন্ট' বলে একটা শব্দ আছে, কোনও একটা বয়সের পর প্রত্যেককেই অবসর জীবন যাপন করতে হয়।কিন্তু জাপানের ভাষায় এমন কোনও শব্দই নেই।ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সাংবাদিক ড্যান ব্যুটেনরনে বহু বছর জাপানে কাটিয়েছিলেন, তাঁর মতে জাপানের মানুষদের কাছে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁরা জীবনে অবসর গ্রহণের কথা ভাবতেই পারেননা।

যুবকরা বেশ

কীভাবে দীর্ঘায়ু পান সেই রহস্য উদ্ঘাটনের সময় বিভিন্ন তথ্য হাতে আসে, তাতে করে আমরা জাপানের মানুষরা কী খান, কী পান করেন তা জানার সাথে সাথে খাদ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানতে পারি।তাতে করে বোঝা যায় যে, এই দীর্ঘায়ুর পিছনে 'ইকিগাই' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।ওকিনাওয়া এমন একটা গ্রাম (যা ব্লু জোন নামে পরিচিত) যেখানে বহু বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষ বাস করেন। সেখানে গবেষণা চলাকালীন আমাদের হাতে বেশ কিছু অসাধারণ তথ্য উঠে আসে।যেমন ধরুন:

এরা যে শুধু বহু বছর বাঁচে তাই নয়, সেই সাথে ক্যান্সার বা হৃদরোগের মতো কঠিন অসুখও তাঁদের শরীরে দেখা যায় না।

এখানকার মানুষেরা এতটাই আনন্দের সাথে নিজেদের জীবন কাটান যে, দেশের বাকি মানুষরা তা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের শরীরের রক্তে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এদের ক্ষেত্রে সেটা খুব কমই দেখা যায়।তাঁরা নিজের পেট ৮০ শতাংশ খাবার আর বাকিটা চা দিয়ে ভরায়, তাঁদের মতে এই অভ্যাসই এর কারণ।

রজঃস্বলা শেষ হওয়ার পরেও সেখানকার মহিলারা যথেষ্ট সুস্থ থাকেন এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কও অনেক বয়স পর্যন্ত থাকে।

আলঝাইমারের মতো অসুখের সম্ভাবনাও তাঁদের ক্ষেত্রে খুবই কম দেখা যায়।

যদিও আমরা এই পুস্তকে এই বিষয়ে আলোচনা করতে বসিনি, তবে তাঁদের দীর্ঘায়ুর পিছনে 'ইকিগাই'-এর ভূমিকা কতটা সেটা এই অধ্যয়নের থেকে স্পষ্ট করতে হবে।

'ইকিগাই' শব্দের অর্থ

জাপানের ভাষায় 'ইকিগাই' শব্দের অর্থ ( ) এইভাবে লেখা হয়।তাতে ( ) এর অর্থ জীবন আর পরিভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ( ) এই শব্দকে যদি আমরা দুটি ভাগে লিখি ( ) তাহলে এর অর্থ হল প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা (যিনি সর্বদা যুদ্ধে প্রথম স্থানে থাকেন) আর ( )এর অর্থ সুন্দর।

দীর্ঘায়ু লোকেদের পাঁচটি টাপু (ব্লু জোন্স)

ব্লু জোনের প্রথম স্থানে ওকিনাওয়া গ্রামের মানুষদের দেখা যায়।পৃথিবীর অন্য প্রান্তের তুলনায় এখানকার মহিলারাও অনেক বেশি বাঁচেন এবং তাঁরা সুস্থ জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হন।ড্যান ব্যুটেনের এমন পাঁচটি স্থানের অধ্যয়ন করেছিলেন, নিম্নে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হল:

ওকিনাওয়া, জাপান (দক্ষিণ প্রান্ত)-এখনকার মানুষরা খাদ্য তালিকায় টোফুর মতো উপকারী সবজি রাখেন।সেই সাথে তাঁরা 'ইকিগাই' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন ও 'বন্ধুত্বের সামান্য স্পর্শ' তাঁদের দীর্ঘায়ু প্রদান করে।

সার্ডিনিয়া, ইতালি (নিউওরা এবং ওগ্লিস্ট্রে-র এলাকা) - লোকেরা খুব বেশি পরিমাণ সবজি খান, সেই সাথে তাঁরা প্রতিদিন দুই গ্লাস করে মদ্যপান করেন। ওকিনাওয়ার মতো এখানকার মানুষেরাও মনে করেন, সামাজিক দিক থেকে মানুষের মধ্যে যে বন্ধন আছে, সেটাই তাঁদের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

লোমলিন্দা, ক্যালিফোর্নিয়া - এখানকার 'সেভেন্থ-ডে-অন্ডহেনটিস্ট' দলের লোকেদের ওপর নিরীক্ষণ করা হয়।জানা গেছে আমেরিকার মানুষদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশি আয়ু লাভ করে থাকেন।

দ্যা নিকোয়া পেনিনসুলা, কোস্টা রিকা - নব্বই বছর বয়সের পরেও এখানকার লোকেরা সক্রিয় থাকে।এখানকার লোকেরা মনের সুখে সকাল ৫:৩০-এ ঘুম থেকে ওঠেন এবং মনের আনন্দে ক্ষেতে কাজ করেন।

ইকারিয়া গ্রিস, টার্কি - এই অঞ্চলের সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন ৯০ বছরের বেশি আয়ু লাভ করেন (অথচ আমেরিকায় এর গড় মাত্র ৯%)।এই কারণেই এই অঞ্চলকে বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বীপ বলা হয়। ৫০০ বছর ধরে তাঁরা যে জীবন যাপন করছেন, এর পিছনে সেটার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে বলে মনে করা হয়।

ওকিনাওয়া দ্বীপের বাসিন্দারা কীভাবে দীর্ঘায়ু লাভ করেন, এই পুস্তকের পরবর্তী ভাগে আমরা সেই কথা জানবো, এবং তার পিছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটাও বোঝার চেষ্টা করবো।এই পাঁচটা অঞ্চলের মধ্যে তিনটি হল দ্বীপ, যেখানে জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথেষ্ট অভাব আছে।সেই কারণে সেখানকার মানুষদের একে অপরকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

কিছু মানুষের কাছে অন্যদের সাহায্য করাই তাঁদের জীবনের 'ইকিগাই', আর সেটাই তাঁদের দীর্ঘ জীবনের রহস্য।যাঁরা এই বিষয় গুলি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, দীর্ঘায়ু লাভের পিছনে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তাহল খাদ্য-সংস্কৃতি, ব্যায়াম, 'ইকিগাই' সম্পর্কে বোঝা বা জানা ও সামাজিক সংযোগ।

এই সমাজের লোকেরা নিজেদের জীবন এমনভাবে পরিচালনা করেন যাতে তাঁদের মানসিক চাপ অনেক কম হয়। সেই সাথে তাঁরা আমিষ খাদ্যও খুবই কম খান।উত্তেজক জাতীয় পদার্থের সেবনও কম মাত্রায় করেন।মদ্যপান করেন নাম মাত্র।এমন কোনও ব্যায়াম করেন না যাতে তাঁদের মানসিক বা শারীরিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে, বরং শরীরকে সঠিক ভাবে চালনা করার জন্য প্রতিদিন হাল্কা ও প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের আশ্রয় নেন।নিজেদের ক্ষেতে কাজ করেন, মাইলের পর মাইল হাঁটেন, গাড়িতে যাতায়াত করার বদলে হেঁটে যাতায়াত করাটাই তাঁদের কাছে বেশি পছন্দের।এঁদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরাই নিজেদের বাগানে কাজ করেন এবং সেই সাথে হাল্কা ব্যায়ামের অভ্যাস করেন।

৮০ শতাংশের রহস্য:

জাপানে প্রায়ই একটা প্রবাদ বাক্য ব্যবহার হতে দেখা যায় 'হারা হাচি বু'।খাবার খাওয়ার আগে এই কথার ব্যবহার করা হয়।এতটাই খান যাতে আপনার পেটের ৮০% ভরে।এটা অনেক প্রাচীন প্রবাদ, এতে পেট ভরে না খাওয়ার পরামর্শ

দেওয়া হয়।ওকিনাওয়ার মানুষেরা পেটের ৮০% ভরে খাবার খান, তাঁরা কখনই পুরো পেট ভরে খাবার খান না।এতে করে, খাবার হজম করতে আমাদের শরীরকে যে উর্জার ব্যবহার করতে হয় তা অনেকটা সঞ্চয় হয়ে যায়, সেই সাথে অকারণে বৃদ্ধি পাওয়া অক্সিডেশন প্রক্রিয়াও কম করা সম্ভব হয়।

পেট ৮০% ভরলো কিনা সেটা জানার কোনও উপায় আমাদের কাছে নেই।তাই যখনই আপনার পেট ভরে গেছে বলে মনে হবে, সঙ্গে সঙ্গে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিন।কখনই বেশি পেট ভরে খাবেন না, অকারণে মুখ চালাবেন না, বেশি মিষ্টি জাতীয় খাবার খাবেন না, খাওয়ার পর ফলের রস বা ঠাণ্ডা পানীয় খেতে আমাদের সকলেরই ভালো লাগে তবে আপনি যদি এগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারেন তাহলে দীর্ঘ জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

কীভাবে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।জাপানের লোকেরা ছোট ছোট থালায় খাবার খান। তাতে করে সেখানকার লোকেরা কম খাবার খায়।জাপানে এক অদ্ভুত ধরনের থালায় খাবার পরিবেশন করা হয়। চারটে ছোট ছোট থালার সাথে একটা অপেক্ষাকৃত বড়ো থালা সহ মোট পাঁচটি থালায় খাবার পরিবেশন করা হয়।আপনি যখন দেখবেন যে আপনাকে পাঁচটা থালায় খাবার দেওয়া হয়েছে, তখন আপনার মনে হবে আপনি ভরপেট খাবার পেয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু খাবার শেষ হওয়ার পর আপনি বুঝতে পারেন, আপনি কম খাবার খেয়েছেন আর তখনও আপনার পেটে খিদে থেকে যায়।এই কারণেই যখন কোনও বিদেশী মানুষ জাপানে কাজ করতে যান তখন তাঁর ওজন কমে যায়।

সম্প্রতি একটা গবেষণায় দেখা গেছে সেখানকার লোকেরা সারাদিনে ১৮০০ থেকে ১৯০০ ক্যালরিজ গ্রহণ করেন।আমেরিকার লোকেদের মাংসপেশির ইনডেক্স ২৬ থেকে ২৭ হয় অন্যদিকে ওকিনাওয়ায় তা ১৯ থেকে ২২ হয়।

ওকিনাওয়ায় বসবাসকারী মানুষদের খাদ্য-সংস্কৃতির মান খুবই উচ্চমানের।তাঁরা সপ্তাহে তিনবার টোফু, শালগম এবং মাছ খান।তাঁরা প্রতিদিন ৩০ গ্রাম সব্জি খান।পুষ্টি সংক্রান্ত যে অধ্যায়টি এখানে আছে তাতে আমরা বিস্তারিত ভাবে এই ৮০ শতাংশের মধ্যে কী কী আসছে তা জানবো।

মোআই: জীবনের সাথে মেলবন্ধন

ওকিনাওয়ার মানুষদের কাছে জীবনের আর এক নাম বোধহয় বন্ধুত্ব, তাঁরা আশেপাশের লোকেদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন।এটা তাঁদের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ।মোআই-এর অর্থ হল একই উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া জনগোষ্ঠি।এই সমাজের বহু লোকের কাছে সমাজ সেবাই হল তাঁদের 'ইকিগাই'।বহু বছর আগে থেকেই 'মোআই'-এর সংকল্প শুরু হয়ে গিয়েছিল।সেই অনুসারে যাঁর ক্ষেতে শস্য কম হত, অন্য কৃষকেরা তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

'মোআই'-এর সদস্যরা প্রতিমাসে চাঁদা হিসাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করেন।যখন তাঁদের দেখা হয় তখন তাঁরা এই সঞ্চিত টাকা খরচ করেন, তাঁরা খাবার খান, নিজেরা গল্প করেন আর 'গো এণ্ড শোগি' (দাবার মতো এক ধরনের খেলা) খেলেন।

এই ধরনের খেলার পর যে পয়সা থেকে যায় তা এই দলের কোনও এক সদস্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়।(রোটেশন অনুসারে এর নির্বাচন করা হয়।)এইভাবেই মোআই-এর সদস্যদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ হয় এবং তাঁদের মানসিক খিদেও পূরণ হয়।যদি মোআই-এর কোনও সদস্যের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁকে ঋণ দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়ের হিসাব রাখা হয় এবং প্রত্যেক সদস্য নিজেদের দায়িত্বের পালন করে কীভাবে দলের উন্নতি সাধন করা যায়

সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন।এই কারণেই প্রত্যেক সদস্যের মনে একটা সুরক্ষার ভাবনা থাকে, কারণ তাঁরা জানেন সাহায্যের জন্য সম্পূর্ণ দল প্রতিটা সদস্যের পিছনে আছে, এই ধরনের মানসিকতা তাঁদের চিন্তার থেকে দূরে রাখে এবং তাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করতে সক্ষম হন।

এখনও পর্যন্ত আমরা 'ইকিগাই' সম্পর্কে খুবই সামান্য কিছু জানতে পেরেছি। এখনকার যুগে একটা বিষয় খুব বেশি করে চোখে পড়ছে, মানুষেরা বয়সের আগেই যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করার সাথে সাথে 'ইকিগাই' থেকে আমাদের কী কী লাভ হতে পারে সেদিকেও তাকিয়ে দেখবো আমরা।

২.

বয়স বাড়তে না দেওয়ার রহস্য

ছোট-ছোট বিষয় আপনাকে আনন্দে ভরা দীর্ঘ জীবন দান করে

বয়স বৃদ্ধির পিছনের গল্প

গত শতাব্দী থেকে আমরা আমাদের গড় আয়ু প্রতি বছর ০.৩ বছর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। একবার ভেবে দেখুন তো, যদি আমাদের কাছে এমন কোনও তন্ত্র জ্ঞান থাকতো যার দ্বারা আমরা নিজেদের গড় আয়ু প্রতি বছর একবছর করে বৃদ্ধি করতে পারতাম তাহলে আমরা নিজেদের বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অনেকটা পিছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হতাম।আর জীবশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে অমরত্ব লাভ করতে পারতাম।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন রে কুর্জওয়েল এবং ঔব্রেয় দ্যা গ্রে, তাঁদের মতে আগামী ১০ বছরের মধ্যে আমার এই লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হতে পারি।তবে বহু পন্ডিত মনে করেছেন এমনটা অসম্ভব, তাঁদের মতে তন্ত্র জ্ঞান যতই বিকশিত হোক না কেন একটা নির্দিষ্ট সীমার পর বয়স কিছুতেই কম করা সম্ভব না।কিছু বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ মনে করেন ১২০ বছর বয়সের পর আমাদের শরীরে নতুন মাংসপেশি সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

অমরত্ব এবং খরগোশ

মনে করা যাক বহু দূরে একটা বোর্ড লাগানো আছে, তাতে একটা সংখ্যা লেখা আছে। সেই সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।এই বোর্ড হল আপনার ভবিষ্যৎ আর আপনি ক্রমাগত সেই বোর্ডের দিকে এগিয়ে চলেছেন।জীবনের একটা করে বছর কাটছে আর আপনি সেই বোর্ডের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ওই বোর্ডের কাছে পৌঁছে যাওয়া মানেই আপনি মৃত্যুর মুখে ঢোলে পড়বেন।

এবার এইভাবে ভেবে দেখুন, ওই বোর্ড ধরা আছে এক খরগোশের হাতে আর সেও ভবিষ্যতের দিকেই এগিয়ে চলেছে। আপনি যখন এক বছর এগিয়ে যান খরগোশ তখন ছয় মাস এগিয়ে যায়, এইভাবে একটা সময় আপনি সেই খরগোশের কাছে গিয়ে পৌঁছাবেন ও আপনার মৃত্যু হবে।

কিন্তু যদি সেই খরগোশ প্রতি বছর এক বছর করে এগিয়ে যায় তাহলে কী হবে? তাতে করে গতি সমান হওয়ার জন্য আপনি কোনও দিনও সেই খরগোশের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না, আর আপনি অমরত্ব লাভ করবেন।

খরগোশ যে গতিতে ভবিষ্যতে চলছে সেটাই আমাদের তন্ত্রজ্ঞান।প্রযুক্তি যত এগিয়ে যাবে আর আমরা নিজেদের শরীরকে যতটা বুঝতে পারবো আমাদের খরগোশ ততটাই দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে সফল হবে।

অমরত্ব বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন আমরা প্রতিবছর খরগোশকে আরও এক বছর এগিয়ে দিতে পারবো, তবেই তা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে, আমরা অমরত্ব লাভ করতে সক্ষম হব।

কার্যক্ষম মন, যুবা শরীর

এক অতি প্রাচীন প্রবাদ আছে, 'সুস্থ শরীরেই সুস্থ মনের বাস', তবে এমন অর্থপূর্ণ প্রাচীন প্রবাদ আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে।এই প্রবাদ থেকে আমার এটা বুঝতে পারি যে, শরীর ও মন দুটোই কতটা গুরুত্বপূর্ণ।এই দুটির সুস্থ থাকা একে অপরের উপর নির্ভর করে।অর্থাৎ একটা কথা খুবই স্পষ্ট, যৌবনকে ধরে রাখার জন্য সর্বদা খোলা মনে বাঁচতে হবে ও মনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।আপনার মন যত বেশি দৃঢ় হবে, আপনার মনে তত বেশি উন্মাদনা থাকবে, তাতে করে আপনার ওপর বয়স বৃদ্ধির প্রভাব খুবই কম দেখা যাবে।

ব্যায়াম করার অর্থ শরীরকে চালনা করা, এই চালনাটুকু না থাকলে আমাদের শরীর ধীরে ধীরে অকেজ হয়ে যায়, এতে করে আমাদের দৃঢ়তা শক্তির উপরেও একটা কুপ্রভাব পড়ে।ঠিক তেমনি যদি আমরা মানসিক ব্যায়াম না করি তাহলে আমাদের নিউরোলজিক্যাল যন্ত্র ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে।এতে করে পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে আমরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি তা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করবে।তাই মস্তিষ্কের ব্যায়াম করাটাও খুবই জরুরি।

মস্তিষ্ক ও মনের ব্যায়ামও খুবই জরুরি,এমনটাই মনে করেন নিউরোলজিস্ট শলোমো ব্রেঝনাইট। তিনি মনে করেন, "মস্তিষ্ককে সর্বদা উত্তেজিত ও কার্যক্ষম রাখার জন্য তার ব্যায়াম করাটা খুবই জরুরি।" স্প্যানিশ টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এডওয়ার্ড পুনসেট বলেছিলেন-

"কাউর জন্য কোনটা ঠিক বা তার কী করতে ভালো লাগে তার মধ্যে প্রায়ই দ্বিধা দেখা যায়, যার থেকে সৃষ্টি হয় মানসিক চাপের।সাধারণত কোনও বয়স্ক মানুষ সেটা করতেই ভালোবাসেন যা তিনি আজ পর্যন্ত করে আসছেন।আসলে সবক্ষেত্রে তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না।মস্তিষ্কের কাজ করার পদ্ধতিটাই এমন, নতুন কিছু চিন্তা করার বদলে পুরানো বিষয়কেই বারংবার আওড়াতে পছন্দ করে আমাদের মস্তিষ্ক।আমরা যদি সারাক্ষণ একই ধরনের কাজ করি তাহলে তা আমাদের কাছে অনেক সহজ বলে মনে হয়, যাতে করে তা করতেও আমাদের সুবিধা হয়। তবে তাতে করে আমাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়না, প্রতিদিনকার জীবনেও আমরা কোনও ভাবেই লাভবান হতে পারিনা।তাই বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই দৈনন্দিন জীবনের রুটিং পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনও রকম উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়না।কারণ, তিনি সেটা করতেই মজা পান।আপনি যদি এই শৃঙ্খলা ভাঙতে চান তাহলে নিজের মস্তিষ্ককে নতুন নতুন তথ্য প্রদান করতে শুরু করুন।

যখনই আপনার মস্তিষ্ক নতুন কোনও তথ্য প্রাপ্ত করে তখনই তা নতুন সংযোগ গড়ে তোলে এবং পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে।তাই সর্বদা নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা করা বা কোনও পরিবর্তনকে মেনে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।প্রথম প্রথম তা আপনার কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে, আপনি মানসিক চাপ বোধ করতে পারেন, তাসত্ত্বেও আপনাকে নিজের আরামের জাল ছিন্ন করে বাইরে বেরোতে হবে।

আপনি যদি নিজের মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন তাহলে কীভাবে লাভবান হতে পারবেন সেই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাছেও আছে। কোলিন্স হেমিংগভে এবং শ্লোমো ব্রেঝনিটস নিজেদের লেখা পুস্তক 'ম্যাক্সিমাম ব্রেন পাওয়ার:চ্যালেঞ্জিং দ্যা ব্রেন ফর হেলথ এণ্ড উইজডম'-এ লিখেছেন মানসিক প্রশিক্ষণের দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে লাভবান হতে পারি।তাঁদের মতে যখনই আপনি কোনও কাজ প্রথমবার করেন তখন তা আপনার কাছে কঠিন বলে মনে হয়।তা সম্পূর্ণ করতে আপনাকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হতে পারে।কিন্তু যখন আপনি দ্বিতীয়বার সেই কাজে হাতে দেন তখন আপনার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা আপনাকে সাহায্য করে যার ফলে তা অনেকটা সহজ বলে মনে হয়।আসলে কাজ কিন্তু আপনি একই করছেন, তবে প্রথমবারের অভিজ্ঞতা একই কাজকে আপনার কাছে সহজ করে দিচ্ছে।তাতে করে কাজের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় এবং কাজের গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। তখন যেকোনও মানুষের ক্ষেত্রেই কাজটা ধীরে ধীরে সহজ হয়ে ওঠে।

মানসিক ব্যায়ামের সাধারণ একটা উদাহরণ হল, আপনি যখন কাউর সাথে গল্প করেন বা খেলেন তখন আপনার মন এক নতুন ধরনের দৃঢ়তা লাভ করে।এতে করে একাকিত্ব ও হতাশা দূরে পালায়।

কুড়ি বছর বয়স পার করার পরেই আমাদের নিউরনস (মস্তিষ্কের পেশী) বয়স্ক হতে শুরু করে।বুদ্ধির খেলা, জানা বা শেখার ইচ্ছা আমাদের নিউরনস গুলিকে বয়স্ক করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীরে করে দেয়,যার ফলে বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও ধীরে সম্পন্ন হয়।সেই সাথে আমরা পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাই ও যে দৃঢ়তা লাভ করি তা আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই লাভবান করে তোলে।

মানসিক চাপ: দীর্ঘায়ুর শত্রু

এমন বহু মানুষ আছেন যাদের বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বুড়ো বলে মনে হয়।গবেষণা করে দেখা গেছে মানসিক চাপের পিছনে বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করে।মানসিক চাপ আপনার শরীরকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তত ক্ষতি আর কেউ করতে পারেনা।'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' শারীরিক ক্ষতির পিছনে কী কী কারণ কাজ করে সেই বিষয়ে একটা গবেষণা করেছে, তাতে করে মানসিক চাপকেই আমাদের অসুস্থতার সবচেয়ে বড়ো কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে।

হিডলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তাররা একটা গবেষণা করেন।এই গবেষণা চালানোর জন্য, তাঁরা এক অল্প বয়সী ডাক্তারকে সাক্ষাৎকারের জন্য পাঠান।এই সাক্ষাৎকারকে জটিল করে তোলার জন্য তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিছু কঠিন অংক সমাধান করতে দেওয়া হয়, ত্রিশ মিনিট পরে সেই ডাক্তারের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়, যাতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রাকৃতিক ভাবেই আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, এক্ষেত্রে শরীরে তা তৈরি হতে দেখা গিয়েছিল।কিন্তু শুধু যে রোগগ্রস্থ পেশী গুলির উপরেই এই প্রতিরোধ ক্ষমতা কাজ করে তা নয়, বরং সুস্থ পেশী গুলিকেও আক্রমণ করে, আর সেটাই সবচেয়ে চিন্তার বিষয়।সেই কারণেই বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও বুড়ো বুড়ো লাগে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রায় এই একই গবেষণা করা হয়েছিল।এই গবেষণার সময় ৩৯ জন মায়ের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।যে সমস্ত মায়ের সন্তানরা গভীর কোনও রোগে আক্রান্ত ছিল তাদের সাথে সাথে সুস্থ সন্তানদের মায়েদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়।তখন তাঁরা এটা বুঝতে পারে যে, মানসিক চাপ পেশী গুলির উপর হামলা করে যার ফলে নতুন পেশী গঠনের যে প্রক্রিয়া তা ধীরে হয়ে যায় আর পেশী গুলি বয়স্ক হতে শুরু করে।এই গবেষণা থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, মানসিক চাপ যত বেশি হবে আমাদের মাংসপেশী গুলির উপর তত কু-প্রভাবের সৃষ্টি হবে।

মানসিক চাপ কীভাবে কাজ করে?

আজকাল মানুষের জীবন মানে প্রতিযোগিতার জীবন, প্রতি ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের।এমন ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই শারীরিক সমস্যার সঙ্কেত পেয়ে থাকি আর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শারীরিক চাপের সৃষ্টি হয়।

এমনিতে এই প্রক্রিয়াটিকে (অর্থাৎ, সৃষ্ট চাপ) ভালোই বলা চলে, কারণ এরফলে আমরা আমাদের আশেপাশের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে পারি।এইভাবে ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়েই আমরা কঠিন পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাই ও সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি।

আমরা যখনই কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা দেখতে পাই তখনই আমাদের মস্তিষ্কের পিটিউটারি গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার দ্বারা আমাদের শরীরে হরমোনস তৈরি হয়, যা কর্টিকোট্রোপিন নির্মাণ করে।যা আমাদের নার্ভস সিস্টেমের দ্বারা সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। এরপর খবর পৌঁছে যায় এড্রেনালিন গ্রন্থিতে আর এই গ্রন্থি কর্টিসোল নির্মাণের কাজ করে। এড্রেনালিন আমাদের শ্বাস গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে ও পালস রেট বৃদ্ধি করে।এতে করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র সামনে আসা বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ওই সময় কর্টিসোল আমাদের শরীরের ব্লাড গ্লুকোজ এবং ডোপামাইনের মাত্রা বৃদ্ধি করে যার ফলে আমরা চার্জ হয়ে যাই এবং সমস্যার সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

আপাত দৃষ্টিতে এই চাপ আমাদের জন্য খুবই কার্যকরী এবং তা আমাদের রক্ষা করে।কিন্তু যদি কম সময়ের মধ্যে বারবার এই চাপের সৃষ্টি হয়, তাহলে অবশ্যই তা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হবে।

আপনি যদি ক্রমাগত মানসিক চাপের মধ্যে দিন কাটান তাহলে তা আপনার শরীরের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হবে।মস্তিষ্কের যে পেশী গুলি স্মরণশক্তির কাজ করে, অতিরিক্ত মানসিক চাপ সেই পেশী গুলির উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে, তাতে করে আপনার ভেতরে নেগেটিভ প্রভাবের সৃষ্টি হয়।মানসিক চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে তার থেকে হতাশার জন্ম হয়।যে হর্মোনসের প্রভাবে আপনি হতাশার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ সেই হর্মোন সৃষ্টির পথে বাধার সৃষ্টি করে।পরিণাম স্বরূপ আপনার ভেতরে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যেমন ধরুন খিটখিটে স্বভাব, ঘুম না আসা, চিন্তা ও উচ্চ রক্তচাপ।

বৃদ্ধ মানুষ	প্রগতিশীল লোক
- বেশিরভাগ সময় শান্ত বসে থাকে।	- সর্বদা ব্যস্ত ও সম
- বিশেষ কিছু ঘটনার কারণে মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন।	- সর্বদা অনলাইনে
- প্রকৃত সমস্যার মধ্যে থাকেন তাঁরা।এই সমস্যা তাঁদের জীবন-মরণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।	- অনেক সময় এক
- সমস্যা প্রকৃত হওয়ার কারণে সমস্যার সময় কর্টিসোল ও অড্রেনাইলের প্রবাহ শরীরকে সুস্থ রাখে।	- সর্বদা কম মাত্রায়

-

আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাই তা আমাদের শরীর ও মনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে, কিন্তু যদি আপনি সময়ের আগেই বুড়ো হতে না চান তাহলে আপনাকে দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আনতে হবে, কীভাবে নিজেকে মানসিক চাপের থেকে দূরে রাখা যায় সেটা দেখতে হবে।

মানসিক চাপ কম করার জন্য আপনাকে সর্বদা

সজাগ (মাইন্ডফুল) থাকতে হবে

যে ভয় আপনাকে চেপে ধরেছে তা সত্যি হক বা মিথ্যে, তার থেকে যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় তা আপনার শরীরে অবশ্যই কু-প্রভাবের সৃষ্টি করে।এতে করে আমাদের হজম শক্তি তো কমে যায়ই, সঙ্গে ত্বক ও বিভিন্ন অঙ্গে কু-প্রভাবের সৃষ্টি হয়।

তাই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমাদের তার সমাধান খুঁজে নিতে হবে, অনেকেই তার জন্য মাইন্ডফুল অর্থাৎ সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।মানসিক চাপ মুক্ত থাকার জন্য সজাগ থাকাটা খুবই জরুরি।আমরা কোন পরিস্থিতিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি, তার উপর আমাদের সজাগ থাকার বিষয়টা অনেকটাই নির্ভর করে।এতে করে আমরা বর্তমান নিয়ে বাঁচতে পারি, নিজেদের বিচারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারি।

কোনও এক সময় অসুস্থতা ও মানসিক চাপ রবার্ট অলসিবারকে জর্জরিত করে দিয়েছিল, কিন্তু মাইন্ডফুলনেসের সাহায্যে তিনি যে শুধু নিজেকে বাঁচাতে পড়েছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সার্টিফাইড ইন্সট্রাক্টর হয়ে ওঠেন।এর জন্য তিনি সবার আগে নিজের ব্যস্ত জীবন শৈলী পরিত্যাগ করেন।তাঁর মতে, আমরা আমাদের বিচারগুলি নিয়েও বিচার করতে বসি, সেটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।যে কারণে আমরা একটা চক্রবূহ্যের মধ্যে আটকে পড়ি।আমাদের এই চক্রবূহ্যের থেকে বাইরে আসার কলা শিখতে হবে।আমরা এমন বহু লোককে চিনি যারা খাবার খেতে খেতে ফোনে কথা বলে বা টিভি দেখে। আপনি যদি এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এখনি যে অমলেটটা খেলেন তাতে পেঁয়াজ ছিল কি? উনি উত্তর দিতে পারবেন না।সজাগ থাকার জন্য আপনাকে সবার আগে যে পথটা বেছে নিতে হবে তাহল ধ্যান অর্থাৎ মেডিটেশন।এই বিশ্ব প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্ন রকম বার্তা প্রেরণ করে, ধ্যান সেই বার্তা গ্রহণের ব্যাপারে ছাকনির কাজ করে, অর্থাৎ কোন বার্তা আপনার মস্তিষ্ক পর্যন্ত যাওয়া উচিত আর কোনটা না তা ধ্যানের সাহায্যে সহজেই ঠিক করা যেতে পারে। শ্বাসবায়ুর সাথে সম্পর্কিত ব্যায়াম এবং বডি স্ক্যানের মাধ্যমেও আমরা এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারি।

মাইন্ডফুলনেস, অর্থাৎ সজাগ থাকার জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ নেওয়াটা খুবই জরুরি। যদি আমরা সর্বদা মনোযোগ সহকারে এই কাজ করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব।

সামান্য মানসিক চাপ কিন্তু আপনার জন্য ভালো :

অত্যাধিক মানসিক চাপ আপনার শরীর ও দীর্ঘায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তা আপনার জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সামান্য মানসিক চাপ আপনার জন্য খুবই লাভজনক।

ড. হবার্ড এস. ফ্রিডমন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর তিনি মানসিক চাপ নিয়ে বিভিন্ন কাজ করেছেন, মানুষের জীবনের উপর চাপ কতটা প্রভাব বিস্তার করে সেটাই ছিল তাঁর গবেষণার মূল বিষয়।তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ মানসিক চাপ থাকে তাহলে তা যেকোনও সমস্যার সাথে লড়াই করার শক্তি সরবরাহ করে।এই ধরনের মানুষেরা বহু দিন বাঁচেন এবং একটা সুন্দর জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হন।এর থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত, যারা নিজেদের মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাদের ওপর মানসিক চাপ পজেটিভ প্রভাব সৃষ্টি করে।এরফলে তাদের জীবন আনন্দে ভরে ওঠে এবং তারা মদ্যপান বা ধূম্রপানের মতো অভ্যাসের থেকে দূরে থাকে।

এই পুস্তকে আপনি এমন কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হবেন যাঁরা ১০০ বা ১১০ বছরের দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন।তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আপনি বুঝতে পারবেন তারা কতটা ভালো জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সবচেয়ে বড়ো কথা হল তাঁরা একটা কর্মময় জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন।

বসে থাকা বয়স বৃদ্ধির কারণ হতে পারে

পশ্চিমের এক স্থানে বসে কাজ করার সংস্কৃতি মাথা চারা দিয়ে উঠেছে।এতে করে উচ্চরক্তচাপ ও স্থূলতার মতো রোগকে তারা আহ্বান জানাচ্ছে।সেই সাথে বয়সের ওপরেও বিশেষ প্রভাবের সৃষ্টি হয়।আপনি যদি ঘরে বা বাইরে যেকোনও স্থানে অনেকক্ষণ একই জায়গায় বসে কাজ করেন তাহলে তা আপনার মাংসপেশী গুলিকে দুর্বল করে তোলে। তাতে করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। একই জায়গায় বসে থাকার কারণে হাইপারটেনশন, বদহজম, হৃদরোগ বা হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে।সম্প্রতি একটা গবেষণাতে দেখা গিয়েছে, যারা একই জায়গায় বসে কাজ করেন তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় কম, এদের শরীরের কার্যক্ষমতা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

যাঁরা কোনও অফিস বা কম্পানিতে কাজ করেন শুধুমাত্র তাঁরাই যে এমন সমস্যায় পড়েন তা নয়, সব বয়সের সমস্ত রকম মানুষের ক্ষেত্রেই এমন সমস্যা দেখা যায়।কিছু বাচ্চাদের মধ্যেও একই স্থানে বসে থাকার অভ্যাস দেখা যায়, তাদের মোটা হতেও খুব বেশি সময় লাগেনা। মোটা হওয়ার এই প্রবণতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকম রোগকে আমন্ত্রণ জানায়, তাই ছোট বয়সে সক্রিয় জীবন অতিবাহিত করার অভ্যাস করাটা খুবই জরুরি।

এক জায়গায় বসে না থাকাটা খুব কঠিন কাজ নয়। আপনি নিজের দৈন্দিন জীবনে সামান্য পরিবর্তন আনলেই এমন সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।আপনি যদি নিজেকে ভেতর ও বাইরে সমান ভাবে সক্রিয় রাখতে চান, তাহলে আপনাকে জীবনে খানিকটা পরিবর্তন আনতেই হবে।তার জন্য আপনাকে কয়েকটা বিষয়কে নিজের জীবনের অঙ্গ করে তুলতে হবে:

অফিস যাওয়ার সময় হেঁটে যান।যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে যেভাবেই হোক দিনে অন্তত ২০ মিনিট হাঁটুন।

লিফটের বদলে সিঁড়ির ব্যবহার করুন।এতে করে আপনার মাংসপেশি গুলি দৃঢ় হয়ে উঠবে।আপনার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াও ভালো হয়ে যাবে।

বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করুন।এতে করে টিভির সামনে বসে আপনি যে ব্যর্থ সময় অতিবাহিত করছেন তার পরিবর্তে আপনার শরীর খানিকটা হাঁটা চলার সুযোগ লাভ করবে।

জাঙ্ক ফুডের বদলে ফল খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে করে আপনাকে বারংবার খেতে হবে না, আপনার শরীরও একটা ভালো খাবার পাবে।

সঠিক মাত্রায় ঘুমটা খুবই জরুরি। প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুম আমাদের শরীরের জন্য খুবই জরুরি।কিন্তু তার চেয়ে বেশি সময় ঘুমালে আপনার শরীরকে অলসতা ঘিরে ধরবে।

ছোট বাচ্চা বা গৃহপালিত পশুদের সাথে খেলুন বা কোনও সংঘের সদস্য হওয়ার চেষ্টা করুন।এতে করে আপনার শরীর ভেতর থেকে দৃঢ়তা লাভ করে, সেই সাথে মনেও নতুন শক্তির সঞ্চার ঘটে।সেই সাথে নিজের প্রতিভা বিকশিত হয়।

আপনি প্রতিদিন যে কাজ গুলি করেন, সেই বিষয়ে অবশ্যই সজাগ থাকবেন।কী কারণে আপনার শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেই কারণের সন্ধান করে তা বর্জন করুন, তার পরিবর্তে সুঅভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

আপনি যদি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট পরিবর্তন আনতে পারেন, তাতে করে আপনার শরীর ও মন দুইই সতেজ হয়ে ওঠে।আর সেই সাথে আপনি দীর্ঘ জীবনের বীজ বপন করতে সক্ষম হবেন।

সুস্থ থাকার রহস্য:

শরীরের ভেতর ও বাইরে দুই দিকেই আমাদের বয়স বৃদ্ধি পায়।মানছি, শরীর ও মন দুই দিকেই আমরা একসাথেই বড়ো হই। কিন্তু কোনও মানুষের বয়স বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হল তার ত্বক।আমাদের শরীরে যা যা পরিবর্তন আসে আমাদের ত্বকে তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।ত্বককে আমাদের অভ্যন্তেরর আয়না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।যে মডেলরা ফ্যাশন শো-তে অংশ নেন তাঁরা বলেন যেকোনও শো-এর আগের দিন রাতে তাঁরা নয় থেকে দশ ঘণ্টা ঘুমান।যাতে করে তাদের ত্বকে একটা আলাদা সতেজতা দেখা যায়, তা অনেক বেশি সুস্থ লাগে।ইতিমধ্যে বিজ্ঞান প্রমাণ করেই দিয়েছে যে, যৌবন ধরে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হল ঘুমের। আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের শরীরে মেলটোনিন হর্মোনসের সৃষ্টি হয়, যার সাহায্যে আমরা যৌবন ধরে রাখতে পারি।প্রভাবশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট পূর্ণ মেলটোনিন আমাদের বহু বছর বাঁচতে সাহায্য করে। সেই সাথে এর বেশ কিছু লাভজনক দিক আছে:

এর সাহায্যে আমাদের রোগের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার মতো প্রয়োজনীয় রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক ইন্সুলিন সৃষ্টি হয়।

আলজাইমারের মতো রোগের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়।

হৃদরোগের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এই কারণ গুলির জন্যই মেলটোনিন আপনাকে সর্বদা যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করে।৩০ বছর বয়সের পর থেকে মেলটোনিন উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস্ব পায়, সেটা মাথায় রাখবেন। কিন্তু যে প্রক্রিয়া গুলির আলোচনা করা হয়েছে, তার সাহায্যে আপনি মেলটোনিন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন।

সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, খাবারে যেন ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে, সেদিকে বিশেষ ধ্যান দেবেন।

শরীরকে সঠিক মাত্রায় রোদ খাওয়ানোটাও খুবই জরুরি।

দিনে আট থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমান।

মানসিক চাপ, অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিমাত্রায় ধূম্রপান, আপনার গভীর ঘুমের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। অতিরিক্ত কফিন জাতীয় দ্রব্যের সেবন করবেন না।গভীর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে মেলটোনিন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ব্যাঘাত ঘটবে।

কৃত্রিম উপায়ে মেলটোনিন সৃষ্টি করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে, তাতে করে আপনি দীর্ঘায়ুর অধিকারী হতে পারেন।যদি তা করা সম্ভব হয়, তাহলে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সর্বদা যৌবন ধরে রাখার উপায় আমাদের নিজেদের ভেতরেই আছে।

যুবক থাকার দৃষ্টিভঙ্গি:

আমাদের মন অসীম শক্তির অধিকারী।আপনাকে যুবক দেখাবে নাকি বুড়ো তার জন্য আপনার মন অনেকখানি দায়ী। অনেক ডাক্তারই মনে করেন শরীরের যৌবন ধরে রাখার জন্য মনকে চালনা করা বা তাকে দৃঢ় রাখাটা খুবই জরুরি।এটাই ইকিগাই-এর তথ্য।শুধুমাত্র সমস্যার সময় এর ব্যবহার করলেই হবেনা, সর্বদা জোশে পরিপূর্ণ ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে যেতে হবে।

ইওশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণা করা হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে দুটি ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।প্রথমত, সেখানকার মানুষদের মধ্যে অসীম পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, দ্বিতীয়ত তারা সৃজনশীলতার দিক থেকেও খুবই সক্ষম।অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, যারা যেকোনও সমস্যাকেই পজেটিভ দৃষ্টিতে দেখতে জানে এবং নিজের আবেগকে সঠিক পথে চালনা করতে জানে, তারা সঠিক ভাবে দীর্ঘ জীবনের পথেও এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

যারা সমস্যার মধ্যে থেকেও নিজেদের মুখের হাসি ধরে রাখতে জানে, তাদেরকে দেখে সারাজীবন যুবক বলেই মনে হয়। এমন সংযত জীবন শৈলী চিন্তা দূর করতে ও মানসিক চাপ কম করতে সাহায্য করে। যারা একশো বছরের বেশি বাঁচে বা যারা দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়, তাদের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।তাদের জীবনেও বহু সমস্যা আসে, কিন্তু তারা সেই সমস্যা গুলিকে পজেটিভ দৃষ্টিতে দেখতে জানে।তারা হাসি মুখে সমস্যার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তা জয় করতে সক্ষম হয়। ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ হিসাবে আলেকজান্ডর ইমিচকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১১১। এই সুবাদে তাঁর নাম গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডে জায়গা করে নেয়। তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এই দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির পিছনে কী কী কারণ আছে, সেই গুলি জানতে পারি।

দীর্ঘায়ুর আখ্যান:

আমি যখন ওগিমি-তে ছিলাম, তখন একদিন এক মহিলার কবিতা শুনি।সেই মহিলার বয়সও ছিল প্রায় ১০০ বছর।এই কবিতা তিনি নিজের ভাষায় অর্থাৎ জাপানি ভাষায় গেয়ে শুনিয়েছিলেন।বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তাহল:

সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন পাওয়ার জন্য,

সমস্ত খাবারের মধ্যে অল্প খুশি মিশিয়ে খান।

তাড়াতাড়ি শুন, তাড়াতাড়ি উঠুন, আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করুন।

আমি প্রতিদিন শান্তি নিয়ে বাঁচি ও জীবন যাত্রার আনন্দ উপভোগ করি।

সুস্থ ও দীর্ঘায়ুর জন্য, আমি প্রতিটা বন্ধুকে নিজের বলে মনে করি।

গরম, ঠাণ্ডা বা বর্ষা সমস্ত ঋতুই আমার কাছে আপন।

আপনার আঙুলের বয়স কত তা নিয়ে ভাববেন না,

সর্বদা নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে আঙুলের সাহায্যে কাজ করে যান।

সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন আর কাজ করতে থাকুন।

১০০ বছর নিজের থেকেই আপনার হাতে এসে ধরা দেবে।

এবার আমি নিজের আঙুলের ব্যবহার করে পরের পৃষ্ঠায় যেতে প্রস্তুত। এই অধ্যায়ে দীর্ঘ জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে কী রকম সম্পর্ক আছে তা বুঝে নেব।

৩.

লোকথেরাপি থেকে ইকিগাই পর্যন্ত

জীবনের উদ্দেশ্য ও দীর্ঘায়ু

অতিবাহিত করার কলা

লোকথেরাপির অর্থ কী?

ভিক্টর ফ্রাংকলের এক সহযোগী সাইকো এনালিসিস সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, সাইকো এনালিসিসের সময় রোগী শুয়ে থাকে এবং অনেক সময় এমন কিছু কথা বলে দেয় যা সাধারণ সময়ে বলা অতটা সহজ হয়না।তারপর তিনি ড. ফ্রাংকলকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নিজের লোকথেরাপি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন।" তা শুনে ফ্রাংকল বলেন, "এই থেরাপিতে রোগী চেয়ারে বসে থাকেন, আর আমাদের কথা শোনেন, অন্য সময়ে তাঁর পক্ষে হয়তো তা শোনা সম্ভব হয়না।"

ফ্রাংকল বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য বলেছেন, "আমি সর্বদা আমার রোগীকে যে প্রশ্নটা করি, সেটা হল "আপনি এখনও পর্যন্ত কেন আত্মহত্যা করেননি?" এতে করে যেকোনও রোগীই তাঁর বেঁচে থাকার জন্য কোন না কোন ভালো দিকের সন্ধান পান, আর সেটাকেই পাথেয় করে জীবনের পথে এগিয়ে যান।"এখন প্রশ্ন হল, তাহল লোক থেরাপি কী করে?

এর উত্তর খুবই স্পষ্ট: তা জীবনে বাঁচে থাকার জন্য একটা সুন্দর উদ্দেশ্য খুঁজতে সাহায্য করে।

লোকথেরাপি মানুষদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে, যার ফলে তারা জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।তাতে করে নতুন করে বাঁচার আশা খুঁজে পায়, আর সেই জোশ ও উৎসাহকে সঙ্গে নিয়েই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়।সেই সাথে সমস্ত নেগেটিভ চিন্তা গুলি ঝেড়ে ফেলে সমস্যা জয় করার কলা রপ্ত করে ফেলে।

বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য:

ভিয়েনা ক্লিনিক-এ ফ্রাংকল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, লোকেদের বেঁচে থাকার জন্য কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকতেই হয়।তিনি যাদের উপর ভিত্তি করে নিজের গবেষণা চালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৮০% লোক বিশ্বাস করেন যে, তাদের জীবনে বেঁচে থাকার কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে।আর বাকি লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে, তাদের জীবনে কমপক্ষে এমন একটা ঘটনা আছে, যার জন্য তারা মরতেও প্রস্তুত।

জীবনের প্রকৃত অর্থের খোঁজে:

আসলে ফ্রাংকল জীবনের অর্থ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য কী সেটা খুঁজে বার করাই তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।আর তাঁর এই অনুসন্ধান এক অদ্ভুত গতি লাভ করে।লোকথেরাপি বলতে কী বোঝায়, যদি সংক্ষেপে তার আলোচনা করি, তাহলে যে বিষয় গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেগুলি হল:

সাধারণত মানুষ একাকিত্বের যন্ত্রণায় ভোগে, তার থেকেই চিন্তা ও হতাশার জন্ম হয়।

থেরাপিস্ট তাকে এটা বিশ্বাস করতে সাহায্য করেন যে, আপনার ভেতরে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য জানার তীব্র আগ্রহ আছে।

রোগী তার জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য খুঁজে পায় (বিশেষ করে হতাশার দিনে)।

রোগী নিজের ইচ্ছায় সেই উদ্দেশ্য বেছে নেয় বা সে বিষয়ে অসম্মতি জানায়।

সে নিজের জীবনে যে নতুন উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, তার সাহায্যে সমস্যা গুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।নতুন বিচারধারা ও পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে জীবন যাপন করতে থাকে।

ফ্রাংকল নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই জীবন-যাপনের কথা ভেবেছিলেন এমনকী সময় মত তিনি সেটাকে পাথেয় করেই মরতেও প্রস্তুত হয়ে যান।তিনি যখন আশ্চভিটজে বন্দি ছিলেন, তখন জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জীবন থেকে সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়ার পড়েও কোনও পরিস্থিতিকে কোন চোখে দেখবেন বা কীভাবে তার মুখোমুখি হবেন, তা সম্পূর্ণ রূপে আপনার ওপর নির্ভর করছে, সে স্বাধীনতা আপনার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা। কোন মানুষ কোনও মানুষের থেকে সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেনা।তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই চরম সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।আর কাউর থেকে কোনও রকম সাহায্য না নিয়েই তিনি এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন।আর এর থেকে তিনি সারা জীবন প্রেরণাও লাভ করেন।

সাইকো এনালিসিস ও লোকথেরাপির প্রধান পার্থক্য হল:

-

এনালিসিস	লোকথেরাপি
রোগী চেয়ারে আরাম করে বসে থাকে।	রোগী থেরাপিস্টের দিকে মুখ করে বসে।
অতীতের ঘটনা নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।	ভবিষ্যতের বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়।
নিউরনসের অধ্যয়ন করা হয়।	নিউরনসের অধ্যয়ন করা হয় না।
আনন্দ প্রাপ্তির দিকেই বিশেষ ধ্যান দেওয়া হয়।	জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বার করে মুখ্য উদ্দেশ্য।
মানবশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।	আধ্যাত্মিক সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়।
রোগীর মানসিকতা সন্ধানের বিষয়ে বিশেষ ধ্যান দেওয়া হয়।	মানসিকতার সাথে রোগীর প্রকৃত অস্তিত্ব খুঁজে বা
'রোগীরঅনুভব'-এর উপর বিশেষ বল দেওয়া হয়।	'রোগীর অনুভবের' সাথে সাথে 'আধ্যাত্মিক চেতন
মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার চেষ্টা করা হয়।	মনের দ্বিধা দূর করার সাথে সাথে কী কারণে সেই
বিশ্বাসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়না।	বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই পুরো থেরাপি দাঁড়িয়ে
সমস্যা দূর করে রোগীকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।	রোগীকে তার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য কর

অস্তিত্বের লড়াই:

জীবনে যখন কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়না, তখন সবটাই ধোঁয়াশা হয়ে যায়, তখন নিজের অস্তিত্ব নিয়ে একটা হতাশা বোধের জন্ম হয়।ফ্রাংকল এটিকে সাধারণ নিরাশা বলে মানতে পারেননি।তাঁর মতে এই নিরাশার মধ্যে যে উর্জা থাকে তাই নবনির্মাণের কারণ হয়ে ওঠে।সেই কারণেই তাঁর চোখে এই নিরাশা পজেটিভ চিন্তার মর্যাদা পেয়েছে।

অন্য থেরাপি গুলির মতো, লোকথেরাপি এটিকে কখনই মানসিক অসুখ বলে মানতে পারেনি।বরং সেটিকে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান বলেই মনে করেছে।এটা এমন একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিজের থেকে বা অন্য কাউর সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে বার করার চেষ্টা করে।তার সাহায্যেই একটা সন্তুষ্টি অনুভব করে এবং নিজের জীবনের শেষ লক্ষ্য পাওয়ার দিকে যাত্রা করে।

যখনই কোনও মানুষের এমন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখনই লোকথেরাপি তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। সেই সাথে তার ভেতরের দ্বিধা দূর করে এবং তাকে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য কর। 'ম্যান্স সার্চ ফর মিনিং' নামক পুস্তকে ফ্রাংকল এমন কল্পনা করেছেন যাতে করে 'কেন' এবং 'কীভাবে'-র উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। ফ্রাংকল মনে করেন যে, "আমরা আজ পর্যন্ত কী পেয়েছি' এবং 'আমার কী পেতে চাই" এর মধ্যে যে বিস্তর ফারাক থাকে তার থেকেই আমাদের ভেতরে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়।এই মানসিক চাপ আমাদের একটা সুস্থ জীবন প্রদান করে।আমরা যখন জীবনে কিছু পেতে চাই, তখন আমরা আরাম করে বা অলসতার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে চাইনা।তার বদলে আমরা প্রতিযোগিতায় ভরা জীবন যাপন করতে চাই।

এর বদলে, আজকের যুগের মানুষ, তারা কী করতে পছন্দ করে তা না করে তাদের যে পথে চালনা করার চেষ্টা করা হয়, সেই পথেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে।নিজের পছন্দকে একপাশে ফেলে দিয়ে, অন্যেরা যা করছে তা করার জন্য অগ্রসর হয়।শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য করে তুলেছে, যার ফলে নিজের মনের বিরুদ্ধে গিয়েও কাজ করতে প্রস্তুত তারা।কিন্তু তাতে করে ভেতরে যে ঝড় বয়ে যায়, সেই সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে গিয়ে আত্মহত্যার মতো পথ পর্যন্ত বেছে নেয়।

'সানডে নিউরোসিস'-এরই এক প্রকার।রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনে মানুষের সামনে তেমন কোনও কাজ থাকে না,যার ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় তারা কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পায়না।তাদের চারদিকটা কেমন যেন খালিখালি বলে মনে হয়। 'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কী করবো?"-এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করতে হয় তাদের।'কীভাবে আজকের দিনটা আনন্দে কাটানো যায়?' সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে তারা।আসলে তারা ইকিগাই-এর সন্ধান করতে থাকে।

খোঁজার চেষ্টা করে তারা।আসলে

ভিয়েনা পলিটেকনিক হাসপাতালে ফ্রাংকল যখন এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন, তখন উনি বুঝতে পারেন ৫৫ শতাংশ মানুষ কোন না কোন ভাবে নিজের অস্তিত্ব সংকটের লড়াই লড়ছে।

লোকথেরাপির হিসাবে যখনই কোনও মানুষ নিজের জীবনের এই উদ্দেশ্য প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, তখনই সে নিজের এই অস্তিত্ব লড়াইয়ের সংকটে জয়লাভ করে। ফ্রাংকল নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বলেছেন, তারা নিজের উদ্দেশ্যকে কীর্তিতে বদলাতে সক্ষম হয়েছেন।তারা যখন নিজেদের অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখেন তখন তাদের কোনও কষ্ট হয়না, কারণ তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার জন্য তাদের ভেতরে একটা সন্তুষ্টির বোধ জন্ম নেয়।

লোকথেরাপির মাধ্যমে একটা সুন্দর জীবনের দিকে যাত্রা: কিছু বিশেষ তথ্য

সার্টের মতে, আমরা জীবনের উদ্দেশ্য গড়ে তুলিনা, বরং তা খুঁজে বার করি।

আমাদের প্রত্যেকের কাছে জীবনের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে আর জীবনের প্রতিটা পর্বে তার ভেতরে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

যদি আমরা কোনও বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করি তাহলে ঠিক তেমনটাই ঘটতে শুরু করে।ঠিক তেমনি যদি আমরা নিজেদের লক্ষ্যের দিকে প্রয়োজনের বেশি ধ্যান দিতে শুরু করি তাহলে তা নিজের থেকেই আমাদের থেকে দূরে চলে যেতে শুরু করে।

আপনি যদি খুশিতে থাকেন, ভেতরটা যদি দৃঢ়তায় পূর্ণ থাকে তাহলে নিরাশা ও নেগেটিভ চিন্তা আপনার থেকে দূরে সরে যাবে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অসাধারণ ও মহান কার্য করার ক্ষমতা আছে।কিন্তু আমরা মহান উদ্দেশ্য প্রাপ্ত করতে পারব কিনা তা আমরা কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি তার উপর নির্ভর করেনা, বরং সেই পরিস্থিতিতে আমরা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তার উপর নির্ভর করে।

পরবর্তী কিছু পৃষ্ঠায় ফ্রাংকলের করা এই গবেষণা নিয়েই আমরা কথা বলবো, তাতে করে আমরা এটা বুঝতে সক্ষম হব যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কীভাবে আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

থিওরি ১: ভিক্টর ফ্রাংকল

জার্মান কন্সন্ট্রেশন ক্যাম্পে (যেখানে তিনি নিজেই বন্দি ছিলেন) আটক থাকা বন্দিদের উপর গবেষণা করার পর মনোবৈজ্ঞানিকেরা এটা বুঝতে পারেন যে, যে সমস্ত বন্দিরা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে যাওয়ার পর বাইরের জগতে গিয়ে কিছু করার স্বপ্ন দেখছিল তাদের ভেতরে বাঁচার ইচ্ছাটা অনেক বেশি ছিল।ফ্রাংকলের ক্ষেত্রে এই কথাটা বিশেষভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যখন লোকথেরাপির কার্যশৈলী শুরু করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনিই এর প্রথম উদাহরণ।

ফ্রাংকল একটা লক্ষ্য পূরণের কথা ভেবেছিলেন, যার ফলে ওই শিবিরে বন্দি থাকাকালীন তিনি নিজেকে সামলাতে পেরেছিলেন।তিনি যখন সেখান থেকে মুক্তি লাভ করে বাইরে আসেন তখন তাঁর কাছে সমস্ত বিষয় লিখিত রূপেই হাজির ছিল, যা শুধুমাত্র প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।যখন তাঁর সমস্ত লেখা আটক করে নেওয়া হয়, তখনও তিনি পুনরায় সবকিছু লিখতে প্রস্তুত ছিলেন।হয়তো সেই কারণেই ওই শিবিরে হওয়া সমস্ত অত্যাচার তিনি মুখ বুজে সহ্য করতে পেরেছিলেন।শুধু তাই নয়, টায়ফসের মতো ভয়ংকর রোগের হাত থেকেও তিনি নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জীবনের এক আলাদা অর্থ প্রাপ্ত করেছিলেন।তিনি কোন ভাবেই নিজের গবেষণার হাত ছাড়েননি, আর সেই সংক্রান্ত সমস্ত কিছু তিনি ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে লিখে রাখতেন।

থিওরি ২: আমেরিকান রাজনীতিবিদ

উত্তর আমেরিকার এক রাজনীতিবিদ ফ্রাংকলের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিতে এসেছিলেন।অবশ্য তিনি আগে থেকেই আমেরিকার মনোরোগ চিকিৎসকের থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন।ফ্রাংকল তাঁকে একটা খুবই যুক্তিযুক্ত কিন্তু সহজ প্রশ্ন করেন।তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর হঠাৎ কেন কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করার কথা মনে হয়? তখন তিনি বলেন, আমাদের নিয়ম ও পররাষ্ট্র নীতি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না। কিন্তু সরকারের একজন সদস্য হিসাবে আমি সেই নীতি মেনে নিতে বাধ্য।তিনি যে বিশেষজ্ঞের কাছেই যেতেন সেই বলতো, বাবার সাথে তাঁর যে মতের পার্থক্য আছে তা মিটিয়ে নিতে, এবং মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এমন ব্যবহার করতে বলতেন যাতে মনে হয় তাঁদের বিচারের মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই, তাঁদের বিচারধারা সমান।সকলে একই পরামর্শ দেয়, বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেননা।ফ্রাংকল তাঁকে বোঝান যে, মতের পার্থক্যটা তাঁর সমস্যার কারণ নয়, বরং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাটাই তাঁর কাছে সমচেয়ে বড়ো সমস্যা।

এই ঘটনার কয়েক বছর বাদে ফ্রাংকল আর এক রাজনীতি বিদের থেকে জানতে পারেন সেই ব্যক্তি তখন অন্য আর এক ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং তাতে করে তাঁর সমস্ত রকম সমস্যা দূর হয়ে যায়।তিনি কোনও রকম সমস্যা ছাড়াই আনন্দের সাথে নিজের জীবন অতিবাহিত করছিলেন।

ফ্রাংকল'র মতে ওই রাজনীতিবিদের কোনও রকম মনোচিকিৎসার প্রয়োজন ছিলনা।তিনি মানসিক দিক থেকে দুর্বল বা অসুস্থ এমন কথা ভাবারও কোন কারণ ছিলনা।আসলে তিনি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। যখন তিনি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়ে যান তখন তিনি আনন্দদায়ক ও সন্তুষ্ট জীবন যাপন করতে শুরু করেন।

থিওরি ৩: আত্মহত্যা করতে চাওয়া এক মা

এক মা তাঁর এগারো বছরের ছেলে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ফ্রাংকলের ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য আসেন।তাঁর আর এক ছেলে ছিল, কিন্তু সে ছিল জন্মগত প্রতিবন্ধী, তিনি নিজের সাথে ওই ছেলেকে শেষ করে ফেলবেন বলে ঠিক করেন।সেই অনুসারে চেষ্টাও করেন। নিজের দুঃখ ও সন্তানের কষ্ট দূর করার জন্য তিনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই প্রতিবন্ধী ছেলের মনে হয়েছিল তার জীবনে কিছু উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু তার মা যদি নিজে হাতে তাকে মেরে ফেলে তাহলে সেই উদ্দেশ্য কিছুতেই পূরণ হওয়া সম্ভব ছিলেনা।

ওই মহিলা একদিন চার্চে গিয়ে সকলের সামনে নিজের সমস্যার কথা বলেন।তাঁকে সাহায্য করার জন্য ফ্রাংকল আর একজন মহিলাকে মঞ্চে ডাকেন।আর তাকে কল্পনা করতে বলেন যে, সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় আছে সে।তার কাছে অনেক পয়সা আছে,কিন্তু কোনও সন্তান নেই। তখন তার মনে হচ্ছিল সব থাকা সত্ত্বেও তার জীবন ব্যর্থ।

যখন আত্মহত্যা করতে চাওয়া ওই মহিলার সামনে এই কথা বলা হয়, তখন তার মনে হয়. "আরে, আমার কাছে আর কিছু থাকুক বা নাই থাকুন, অন্ততপক্ষে আমার কাছে একটা ছেলে তো আছে, তাই বা কম কী! এই ছেলের জন্য আমি অন্য অনেকের থেকে অনেক বেশি ভাগ্যশালী।আমি এই প্রতিবন্ধী ছেলেকে একটা সুন্দর জীবন দিতে পারি, ও একটা আনন্দে

ভরা জীবন কাটাতে পারবে।আমি নিজের সম্পূর্ণ জীবন দিয়ে সেই সুযোগ প্রাপ্ত করার চেষ্টা করবো, আমার কাছে যে সুযোগ আছে সেটাকে আমি সঠিক করে তুলবই।"

এইভাবে একটামাত্র কল্পনার সাহায্যে যখন তিনি নিজের জীবন নিয়ে ভাবার সুযোগ পান তখন তিনি জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পান, সেই সাথে নিজের জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পান যে বিষয়ে তিনি তখনও পর্যন্ত সজাগ ছিলেন না।

থিওরি ৪: দুঃখে ব্যাকুল ডাক্তার

একবার এক বয়স্ক ডাক্তার ফ্রাংকলের কাছে আসেন থেরাপি নেওয়ার জন্য। মাত্র দুই বছর আগেই তিনি নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন, তাতে করে তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটা যেন দুঃখের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল।সেই নিরাশার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি ফ্রাংকলের কাছে এসেছিলেন। তাঁকে কোন রকম পরামর্শ দেওয়ার আগে, বা তাঁর জীবনে কী কী ঘটনা ঘটেছে তা জানার আগে ফ্রাংকল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "ধরে নিন, আপনার স্ত্রীর বদলে আপনি মারা গিয়েছেন, তাহলে কী হত?"ডাক্তার বলেন, "আমার স্ত্রী খুবই সরল সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, ওকে বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হত।"

সেই কথা শোনার পর ফ্রাংকল বলেন, "দেখুন ডাক্তার আপনি কত মহান মানুষ!আপনি নিজের স্ত্রীকে কত কষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।আপনি নিজে কত কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে সমস্ত কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"

এই কথা শোনার পর ডাক্তার কোনও কথা না বলে ফ্রাংকলের হাতটা ধরে কাঁদেন ও সেখান থেকে চলে যান।কিন্তু তাঁর চোখ না বলা বহু কথা বলে দেয়।তাঁর জীবন যেন নতুন উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল।'আমি আমার স্ত্রীকে অনেক রকম কষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি', এই বিচার তাঁকে আনন্দ দেয় ও তিনি নতুন ভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হন।

মোরিতা থেরাপি:

লোকথেরাপি যে যুগে আবিষ্কার হয়, সেই যুগেই কয়েক বছর আগে জাপানে শোমা মোরিতা জীবন-উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এক থেরাপির নির্মাণ করেন। নিউরোসিস, ওসিডি এবং অপারেশন বা চিকিৎসার পর জীবনে যে নিরাশার সৃষ্টি হতে পারে তার থেকে বাঁচার জন্যই এর ব্যবহার শুরু হয়।

শোমা মোরিতা যে শুধুমাত্র মনরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি একজন বুদ্ধিস্টও ছিলেন।তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে ছিল আধ্যাত্মিকতার ছাপ, যা জাপানে এক নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থার দরজা খুলে দিয়েছিল।

পশ্চিমের বেশিরভাগ মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষের আবেগের দিক নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করা হয়।তাদের নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ও সেই অনুসারে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।কারণ মনে করা হয় যে, আমাদের মনে যে ধরনের ভাবনা থাকে আমরা ঠিক সেই অনুরূপ চিন্তা করি, আর আমাদের চিন্তা প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের কাজের মধ্যে। এর বিপরীতে মোরিতা থেরাপিতে নিজেদের আবেগ বুঝে তা স্বীকার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।কারণ তিনি মনে করেন, আমাদের ভাবনাই আমাদের কাজের দিক নির্দেশ করে।

এখন আমাদের মনে যে ভাবনা গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তা স্বীকার করার সাথে সাথে নতুন ভাবনা নির্মাণের কলাও শিখতে হবে। শোমা মোরিতার মতে অভিজ্ঞতা ও চেষ্টার সাহায্যেই এই কলা রপ্ত করা সম্ভব।

মোরিতা থেরাপিতে কোনও পরিণামকেই অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়না। বরং এই থেরাপিতে আমাদের ইচ্ছা, আকাঙ্খা, ভয়, নিরাশা ও চিন্তার মতো বিষয়গুলিকে স্বীকার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মোরিতা থেরাপির উপর ভিত্তি করে লেখা পুস্তকে শোমা মোরিতা জানিয়েছেন, আপনাদের নিজের আবেগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকা উচিত।

একটা গল্পের মতো করে মোরিতা নিজের মনের কথা গুলি জন সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন।তিনি বলেন, ধরুন একটা গাধাকে দড়ি বেঁধে একটা পিলারের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু অসফল থেকে যায়।সেই চেষ্টার সময় সে এই পিলারটাকে ঘিরে গোল গোল চক্কর কাটতে থাকে, আর ভাবে সে অনেকটা পথ যাত্রা করে ফেলেছে।সে যত চেষ্টা করে, পিলারের সাথে তার সম্পর্ক ততই দৃঢ় হয়ে ওঠে।মানুষের সাথেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে, মানুষ বিভিন্ন বিচারের হাত থেকে যত রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে, তত সে বিভিন্ন বিচারের সাথে আরও দৃঢ় ভাবে জড়িয়ে পড়ে।

মোরিতা চিকিৎসা পদ্ধতির সারাংশ:

নিজের আবেগকে স্বীকার করতে শিখুন: কোনও কাজে হাত দেওয়ার সময় আপনার মনে বিভিন্ন বিচারের জন্ম হয়, এরই মধ্যে কোনও একটা বিচার যদি আপনার উপর চেপে বসে তাহলে তার থেকে পালানোর চেষ্টা করবেন না বা তাকে কোনও ভাবেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।আপনি যদি এমন করেন তাহলে সেই বিচার আরও গভীরতার সৃষ্টি করবে।মানুষের ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেন মাস্টার বলেছেন, আপনি যদি সমুদ্রের একটা ঢেউ দিয়ে আর একটা ঢেউ ভাঙতে চান তাহলে আপনি নিজেই সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যাবেন।কোনও বিচারের নির্মাণ আমাদের হাতে নেই, তা নিজের থেকেই জন্ম নেয়, আমাদের শুধুমাত্র তা স্বীকার করে নিতে হয়। তাকে স্বাগত জানাতে হয়।ভাবনা অনেকটা আবহাওয়ার মতো, আবহাওয়া কখন কী রূপ দেখাবে তা আমার বুঝতে পারিনা, আমরা শুধু তার পরিবর্তিত রূপটা দেখি। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে, তিনি ভিয়েতনামের সাধু 'থিচ হ্যাট হন'-এর একটা পংক্তির স্মরণ করিয়েছেন। ওই পংক্তিতে 'থিচ হ্যাট হন' নিজের একাকিত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আজ তুমি কেমন আছো? চলো, দু'জনে একসাথে বসি, ও তোমার চিকিৎসা করি।''

যা করছেন তাই করুন: পরিণামের কথা না ভেবে নিজের লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকুন ও সেই দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন।কারণ চিকিৎসা পদ্ধতি নিজের কাজ করতে থাকবে।আমাদের জন্য শুধুমাত্র বর্তমানের দিকে ধ্যান দেওয়াটা খুবই জরুরি।যদি পরিস্থিতি স্বীকার করে নিতে কষ্ট হয়, তাহলে সেই কষ্টের দিকে ধ্যান দিন।তার জন্য বুদ্ধি খাটাতে যাবেন না বা কোনও রকম কাল্পনিক বাহানার সন্ধান করবেন না।চিকিৎসকের কাজ হল কোনও রোগীকে পরিস্থিতির মুখোমুখি করার জন্য প্রস্তুত করা।মোরিতা চিকিৎসা পদ্ধতিতে লোকেদের কারণ খোঁজার জন্য বা রোগ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলার জন্য কোনও রকম চাপ দেওয়া হয়না।বরং তাদের নিজেদের কাজ বা অভিজ্ঞতার থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য ছাড় দেওয়া হয়। পশ্চিমে মনরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন ডায়রিতে লিখে বিভিন্ন টিপ্পনি করার পরামর্শ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে তেমন কোনও পরামর্শ দেওয়া হয়না।বরং মানুষদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা খোঁজার পরামর্শ দেওয়া হয়।

নিজের জীবন উদ্দেশ্যের সন্ধান করুন: আমরা নিজেদের মনের বিচার গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা ঠিকই, কিন্তু প্রতিদিন আমরা যে কাজ গুলি করি, সেগুলিকে তো অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।তাই আমাদের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়াটা খুবই জরুরি, সেই কারণে মোরিতা মন্ত্রের পালন করার চেষ্টা করুন।''এখন আমার কী করা উচিত?এখন আমি কী করবো?''এমন প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজের অন্তর থেকেই পেয়ে যান।শুধুমাত্র তা খুঁজুন ও নিজের ভেতরের ইকিগাই-কে খুঁজে বার করার চেষ্টা করুন।

মোরিতা থেরাপির চারটি পর্ব:

মোরিতা থেরাপি প্রায় ১৫ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত চলে।তাতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব থাকে।

আলাদা থাকা ও আরাম (পাঁচ থেকে সাতদিন): প্রথম সপ্তাহে রোগীকে আরাম করার জন্য একটা ছোট্ট কুটিরে পাঠানো হয় ও বাহ্যিক জগতের জিনিস-পত্রের থেকে আলাদা রাখা হয়।টিভি, বই বা বন্ধু প্রভৃতি সমস্ত কিছুর থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়।রোগী বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকে।এই সময় যিনি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি তার সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করতে যান।

যদিও অনেক সময় সে তাঁর সাথেও দেখা করতে চায়না।এইসময় ব্যক্তিকে তার অন্তরে যে পরিবর্তন আসে তার অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।এই সাতদিনে রোগী কিছুই করার সুযোগ পায়না, তাই সে কিছু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সেই কারণে তাকে সমস্যার মধ্যেও দেখা যায়, এখান থেকেই তাকে পরবর্তী পর্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হাল্কা পেশাগত প্রশিক্ষণ (পাঁচ থেকে সাত দিন): এই সময়ে মনোরম পরিবেশে রোগীকে হাল্কা-হাল্কা কাজ দেওয়া হয়। যেমন ধরুন বাগানে কাজ করা, ছবি আঁকা বা রঙ করা প্রভৃতি।এই কাজ গুলি করার সময় তার মনে যে বিচার আসে বা যে বিচারের পরিবর্তন দেখা যায়, সেই গুলি ডায়রিতে লিখতে বলা হয়।এই সময় চিকিৎসক ছাড়া আর কাউর সাথে রোগী কথা বলার অনুমতি পায়না।

পেশাগত থেরাপি (পাঁচ থেকে সাতদিন): এই সময় রোগীকে এমন কাজ দেওয়া হয়, যা করতে তার কষ্ট হয়। ড. মোরিতা নিজের রোগীদের পাহাড়ে নিয়ে যান ও তাদের গাছ কাটতে বলেন।সেই সাথে লেখা, আঁকা, রঙ করা, সিরামিকের বাসন বানানোর মতো কাজ দেওয়া হয়। এই সময় রোগীরা কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যদের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়।

সামাজিক ও বাস্তবিক জীবনের সাথে সংযক্ত হওয়া: এই পর্বে এসে রোগীকে পুনরায় তার নিজের জগতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। নিজের আগের জগতে ফিরে যাওয়ার পরেও ব্যক্তিকে থেরাপির সময় যে ব্যায়াম বা কলা শেখানো হয়েছিল সেই গুলির অভ্যাস করতে বলা হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার একটাই উদ্দেশ্য, পৃথিবীকে একটা নতুন ও বিকশিত মানুষ দেওয়া, যার কাছে জীবনে বেঁচে থাকার কোনও উদ্দেশ্য থাকবে, যে কোনও রকম সামাজিক ও মানসিক চাপ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করে যাবে।

নাইকন ধ্যান পদ্ধতি:

জেন মাস্টর মোরিতো এবং নাইকন আত্ম পরীক্ষণের সাথে সম্পর্কিত ধ্যান পদ্ধতির কথা বলেছিলেন।এই সম্পূর্ণ চিকিৎসা প্রক্রিয়াটিই এই কার্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।তাঁর মতে প্রতিটা মানুষের নিজেকে এই তিনটি মৌলিক প্রশ্ন করা উচিত:

আমি কোনও মানুষের কাছ থেকে কী পেয়েছি?

আমি সেই মানুষটাকে কী দিয়েছি?

আমার জন্য ওই মানুষটার কী কষ্ট হয়েছে?

আপনি যদি নিজেকে এই প্রশ্ন গুলি করতে পারেন, তাহলে কোনও মানুষের জন্য যদি আপনি কষ্ট পান তা লাঘব হয়ে যাবে।তখন সামনের ব্যক্তিকে আর দোষী বলে মনে হবেনা, বরং আপনি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

মোরিতো বলে যদি আপনার কাউর সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা হয় তাহলে তিন দিন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন ও তারপর তার সাথে ঝগড়া করুন, ঝগড়া করার বাসনা নিজের থেকেই কমে যাবে।

আর এবার ইকিগাই:

লোকথেরাপি ও মোরিতো থেরাপি: এই দুটিই আপনি নিজের অভিজ্ঞতার থেকে প্রাপ্ত করতে পারেন। এর জন্য আপনাকে কাউকে পথ দেখতে হবেনা বা কোনও রকম আধ্যাত্মিক শিবিরের প্রয়োজন নেই।ইকিগাই হল আপনার অস্তিত্বের লড়াই। একবার যদি আপনি এই লড়াইয়ে জিতে যান ও আপনার ইকিগাই স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনাকে শুধুমাত্র মন শক্ত করে সাহসের সাথে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

পরবর্তী পর্বে, এই রাস্তা দিয়ে চলার জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন আপনাকে সেই বিষয়ে জানাবো।আপনি যে কাজ করবেন বলে ঠিক করেছেন, সেই কাজের বিষয়ে নিজের ভেতরে আস্থা থাকাটা খুবই জরুরি।আপনি কী খাচ্ছেন সেদিকে নজর রাখবেন, নিয়মিত ব্যায়াম করাটা খুবই জরুরি।কম মাত্রায় করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু নিয়মিত করুন।কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন, তার জোরে আপনি বিশ্বে পরিবর্তন আনতে পারবেন, সেই বলেই নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন।আপনি যে কাজ করতে চান, সেই কাজ করার জন্য আপনি নিজের অন্তর থেকে প্রস্তুত তো?

৪

ফ্লো-র সন্ধানে

নিজেকে আরও বিকশিত করে তোলার জন্য কীভাবে কাজের ও নিজের খালি সময়ের ব্যবহার করবেন?

আমার সর্বদা যা করি, তেমন ভাবেই গড়ে উঠি।তাই উৎকৃষ্টতাকে কোনও কাজ বলা যায়না, সেটা হল আমাদের অভ্যাস।

-অরস্তু

হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেওয়া

মনে করুন, আপনি নিজের সবচেয়ে পছন্দের জায়গায় স্কেটিং করছেন।আপনার চারদিক দিয়ে সাদা বালির মতো বরফ উড়ে বেড়াচ্ছে।চারপাশে যেন আনন্দের বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি খুবই খুশিতে আছেন।

আপনার সম্পূর্ণ ধ্যান রয়েছে স্কেটিং-এর দিকে।কোন সময়ে কীভাবে চলতে হবে, তা আপনি খুব ভালোই জানেন।তা না অতীত, না ভবিষ্যৎ।সেখানে শুধুমাত্র বর্তমানের অস্তিত্ব আছে।চারপাশের পরিবেশ আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলেছে। আপনি নিজের স্কেটিং নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে আর কোনও দিকে আপনার ধ্যান নেই।নিজের সচেতনতা, স্কেটিং ও আপনি আর তিনটি পৃথক বিষয় না থেকে এক হয়ে গিয়েছে।আপনি একটা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন, আপনার মাথায় আর কোনও খেয়াল নেই, ট্রে-র জন্য আপনার কোন কষ্টও নেই। সেই সময় আপনার ভেতরের অহংকার গায়েবা হয়ে যায়, আপনি নিজেই ওই ক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে ওঠেন।গাড়ি চালানোর সময় অনেক মানুষের এমন অভিজ্ঞতা হয়, কেউ প্রকৃতির কোলে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যায় তো কেউ পাহাড়ে ওঠার সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।কেউ আঁকার সময় আঁকার মধ্যে তো কেউ গান গাওয়ার সময় গানের মধ্যে ডুবে যান, তারা তখন কাজের সাথে একাত্ম হয়ে যান।

'বি ওয়াটার, মাই ফ্রেন্ড'।এই পংক্তির মধ্যে দিয়ে ব্রুসলি নিজের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছিলেন।আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কখন না কখনও এই একাত্ম হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।যখন আমরা নিজেদের পছন্দের কাজ করি, তখন আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় বা সময়ের কোনও বোধ কাজ করেনা। কিছু মানুষ খাবার বানাতে এতটাই পছন্দ করেন যে, কয়েক ঘণ্টা কোথা থেকে কেটে যায় তা তারা বুঝতে পর্যন্ত পারেনা।কোন মানুষ বই পড়তে এতটাই ভালোবাসে যে, বই পড়ার সময় কখন তারা সেই বইয়ের মধ্যে ডুবে জগৎ সংসারকে ভুলে যায় তা নিজেরাও টের পায়না।আমরা যখন পুকুরে স্নান করতে যাই বা যখন আমরা সমুদ্রে গিয়ে মেতে উঠি, পরের দিন গা ব্যথা হওয়ার সময় আমরা বুঝতে পারি, কতক্ষণ আমার সমুদ্রে ঝাঁপিয়েছিলাম।কিন্তু যখন আমরা নিজেদের অপছন্দের কোনও কাজে হাত দিই, তখন যেন সময় আর কাটতেই চায়না।বারংবার ঘড়ির দিকে চোখ চলে যায়, আমাদের কাজ বা সময় কোনটাই যেন আর এগোতে চায়না।

এই বিষয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন খুবই মজা করে বলতেন, আপনি যদি গ্যাসের ওপর হাত রাখেন তাহলে এক মিনিটও এক ঘণ্টার সমান হয়ে দাঁড়াবে।অন্যদিকে আপনি যদি কোনও সুন্দরী মেয়ের হাত ধরে বসে থাকেন তাহলে এক ঘণ্টাকে এক মুহূর্ত বলে মনে হবে।এটাই বাস্তব।

এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা বোঝা খুবই জরুরি, তাহল আপনার কাছে যে কাজ আনন্দদায়ক অন্যের কাছে তা কষ্টের কারণ হতেই পারে।এমন কোন কাজ আছে যা করতে আপনি সবচেয়ে ভালোবাসেন, যা করার সময় আপনি সময়ের কথা মাথাতেও আনেন না। সব সমস্যা ভুলে আপনি সেই কাজে ডুবে যেতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই হল ইকিগাই-এর খোঁজ।

ফ্লো-র শক্তি

মনোবৈজ্ঞানিক সিসিক্সজেনমিহলির মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল আর তিনি সেই উত্তর খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। কোনও কাজের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া, সেই কাজ করার সময় জগৎ-সংসার ভুলে যাওয়াকেই তিনি 'ফ্লো' বলেছেন।তাঁর মতে 'ফ্লো' বলতে বোঝায় সেই সময় আমরা আনন্দিত, উৎসাহিত এবং সৃজনশীল জীবন অতিবাহিত করছি, আর মন-প্রাণ দিয়ে সেই কাজ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

ইকিগাই-কে জানার যেমন কোনও সূত্র হয়না, তেমনি এই 'ফ্লো'-তে যাওয়ারও কোনও বিধি নেই।ওই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য বা তা ধরে রাখার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।সেই অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত করার জন্য আমাদের নিজেদের কাজের মধ্যে এতটাই ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে আমরা সহজেই সেই অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত করতে পারি। আপনি যদি চকলেট, টিভি, ড্রাগস বা মদের জগতে নিজেকে ডুবিয়ে দেন তাহলে ক্ষণিকের আনন্দ তো পাবেন, কিন্তু তা কখনই চিরস্থায়ী নয়।

সিসিক্সজেনমিহলি 'ফ্লো:দ্যা সাইকোলজি অফ অপ্টিমল এক্সপিরিয়েন্স' পুস্তকে 'ফ্লো' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এই সময় মানুষ নিজের কাজের মধ্যে এতটাই ব্যস্ত হয়ে যায় যে, তার চারপাশে কী ঘটছে সেদিকে তার ধ্যান পর্যন্ত থাকেনা। এই কাজই তার কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে, সেই কাজের জন্য সে কতটা লাভবান হতে পারে সেদিকেও তার ধ্যান থাকেনা, সে শুধু আনন্দের সাথে নিজের কাজ করে যায়।ওই আনন্দ পাওয়ার জন্য সে চূড়ান্ত সীমায় যেতে পারে।

যারা সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত, শুধুমাত্র তারাই এই অবস্থার আনন্দ উপভোগ করেন তা কিন্তু নয়।বহু এথলিটস, খেলোয়াড়, দাবাড়ু এমনকী বহু ইঞ্জিনিয়ারও এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করে থাকেন।

সিসিক্সজেনমিহলি মনে করেন দাবাড়ু দাবার চাল দেওয়ার সময়, গণিতজ্ঞ গণিতের সূত্র খোঁজার সময় বা ডাক্তার অপারেশন করার সময় এই অবস্থার মধ্যে থাকেন। মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক সিসিক্সজেনমিহলি এই 'ফ্লো' নিয়ে বহু গবেষণা করার পর এই সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রতিটা মানুষের জন্যই এই 'ফ্লো' সমানভাবে কাজ করে।এটা কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করেনা, বয়স, সংস্কৃতি বা বিশ্বের কোন প্রান্তের মানুষ সে তা দিয়ে কিছুই যায় আসেনা। নিউইয়র্ক হোক বা ওকিনাওয়া, যেকোনও প্রান্তের মানুষই এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন।এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেলে কী পরিণাম পাওয়া যেতে পারে?

আমরা যখন 'ফ্লো'-র অবস্থায় থাকি তখন আমরা সম্পূর্ণ রূপে সেই কাজের মধ্যে ডুবে যাই। সেই সময় আমাদের মনে অন্য কোনও বিচার থাকেনা। কিন্তু যখন আমরা 'ফ্লো'-র মধ্যে থাকিনা তখন আমরা হাত দিয়ে এক কাজ করি আর মাথা অন্য কিছু ভাবতে ব্যস্ত থাকে।কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় যদি আপনার মনে হয় আপনার একাগ্রতা শক্তি বারংবার ভঙ্গ হচ্ছে তাহলে নিম্নে যে উপায় গুলি দেওয়া আছে তা পড়ুন, তাতে করে নিজেকে ফ্লো-তে নিয়ে যেতে খুবই সুবিধা হবে।

ফ্লো-র জন্য এই সাতটি বিষয় মাথায় রাখুন:

ওভেন শাফর ডেপোউল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে 'ফ্লো'-তে আসার জন্য নিম্নে যে বিষয়গুলি দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি মন দিয়ে পড়াটা খুবই জরুরি।

কী করতে চান, সেটা জানাটা খুবই জরুরি।

কীভাবে করতে হবে, সেটাও জানতে হবে।

সেই কাজ আপনি কীভাবে আরও ভালো করে করতে পারেন, সেটাও জানতে হবে।

আপনি কোথায় পৌঁছাতে চান সেটাও জানতে হবে অর্থাৎ কাজের দিকটা জানা খুবই জরুরি।

আপনার সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষা করছে, তাও জানতে হবে।

আপনার মধ্যে কোন গুণ থাকতে হবে তা জেনে নিন।

মন কখনই বিচলিত করবেন না।

উপায় ১: কঠিন কাজের সন্ধান করুন

(কিন্তু অতিরিক্ত কঠিন কাজে হাতে দেবেন না)

স্কফারের কার্যপ্রণালী বলছে, এমন কাজ খুঁজুন যা করতে আপনাকে সামান্যতম সমস্যায় পড়তে হতে পারে অর্থাৎ তা যেন আপনার আরামের গণ্ডীর বাইরে হয়।

প্রতিটা কাজের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে, আর সেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই আমাদের সেই কাজ করতে হয়।ঠিক সেই রকম যেকোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মধ্যে কোন না কোন গুণ থাকাটা খুবই জরুরি।আমরা যে কাজ করছি, তা করার জন্য যদি কম গুণের আবশ্যকতা হয় তাহলে সেই কাজ করতে আমাদের নিরস লাগে, সেই কাজ করতে কোনও মজাই লাগেনা।

অন্যদিকে কোনও কাজ যদি আমাদের ক্ষমতার বাইরে হয়, সেই কাজের জন্য যতটা গুণ বা কুশলতার প্রয়োজন তা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে সেই কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভবনা খুবই বেশি হয়।তাতে করে দ্বিগুন ক্ষতির সম্ভবনা দেখা যায়।একেতো সেই কাজ হয়না, আর তারফলে যে নিরাশার জন্ম হয় তাতে করে নতুন কাজ করার প্রেরণাও হারিয়ে যায়।

এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করাটা খুবই জরুরি। তাই নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।এতে করে আমরা প্রেরণা পাব এবং সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আনন্দ উপভোগ করতে পারবো। সেই কারণেই অর্নেস্ট গেমিংগভ বলেন, 'আমি সর্বদা নিজের ক্ষমতার থেকেও ভালো লিখি।'

কাজ করার সময় আমাদের সর্বদা বহু ঝড়-ঝাপটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।তাতে করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারি। বর্টেন্ড রসেল এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, আপনি যদি খুব বেশি একাগ্রতার সাথে কাজ করতে চান তাহলে নিজের ক্ষমতার থেকে একটু কঠিন কাজ খুঁজে নিন।

আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হন, তাহলে পরবর্তী কাজের সময় নতুন কোনও সফটওয়ার শিখুন। আপনি যদি প্রোগ্রামার হন তাহলে নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুন।যদি নৃত্যশিল্পী হন তাহলে পরবর্তী নাচে এমন কোনও স্টেপ করার চেষ্টা

করুন যা আপনি করতে পারেন না বা যা আপনি কখনও করেননি।প্রতিবার কাজ করার সময় সেই কাজের সাথে এমন কিছু সংযোজিত করার চেষ্টা করুন যা আপনার আরামের গণ্ডীকে ছিন্ন করে দেয়।

পড়ার মতো ছোট কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের কিছু নিয়ম পালন করাটা খুবই জরুরি।তার জন্য আপনার ভেতরে আবশ্যিক কিছু গুণ থাকতে হবে। যেমন ধরুন আমরা 'কোয়াটম ম্যাকনিক্স ফর স্পেশাল ফিজিক্স'-এর বিষয়ে পড়ছি, অথচ আমরা পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানিনা, এই রকম অবস্থায় একটু বাদেই আপনি বা আমি বইটা বন্ধ করে রেখে দেব।বা ধরুন আপনি এমন কোনও বই পড়ছেন যে বিষয়ে আপনি সব কিছু জানেন, তাহলেও আপনি সঙ্গে সঙ্গে বইটা বন্ধ করে রেখে দেবেন।

এর বিপরীতে যদি আমরা নিজেদের রুচি বা ক্ষমতা অনুসারে বই পড়ি তাহলে সেই বই পড়তে আমাদের ভালো লাগবে, আমাদের বুদ্ধি খানিকটা রসদ লাভ করবে।সেই সাথে আমরা 'ফ্লো'-তে চলতে শুরু করবো। এই আনন্দ আর ফ্লো-ই আমাদের বলে দেয় আমরা সঠিক পথে চলছি, আর নিজের ইকিগাই অনুসারেই কাজ করছি।

-

সুবিধাজনক	প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ	ক্ষমতার অতিরিক্ত
অলস	ফ্লো	চিন্তা

উপায় ২: স্পষ্ট ও সঠিক লক্ষ্য প্রস্তুত করুন

যে খেলা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে (যেমন ভিডিও গেম, লুডো প্রভৃতি) বা মাঠে গিয়ে যে খেলা খেলতে হয় তাতে 'ফ্লো' প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে।এর সবচেয়ে বড়ো কারণ হল এই খেলাগুলির পিছনে উদ্দেশ্যটা খুবই পরিষ্কার থাকে।খেলার নিয়মানুসারে আপনি যাকে শত্রু বলে বেছে নিয়েছেন তাকে হারানোটাই আপনার সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।সেই সাথে আপনার যত রেকর্ড আছে তা ভঙ্গ করাও আপনার লক্ষ্যে পরিণত হয়।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এই সমস্ত খেলার ক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্যটা যতটা স্পষ্ট হয় জীবনের বাকি কাজের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটা হয়না।বস্টন কনসাল্টিং গ্রূপ একটা গবেষণা করার সময় তাদের কর্মচারীদের বসেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখতে বলে।এর থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিগুলির বেশির ভাগ কর্মচারীদের একটাই অভিযোগ, আর তাহল, আমাদের বস দলগুলিকে মেশিনের সঠিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করায় না।যার জন্য 'আমার কী করবো' সেটাই ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারিনা।

কম্পানির বেশ কিছু সংখ্যক উঁচু তলার লোকেরা প্লানিং করে, স্ট্র্যাটেজি বানায় আর তার সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক কাজ আটকে থাকে।তাদের কাছে কোনও স্পষ্ট বা পাকাপোক্ত লক্ষ্য থাকেনা।আমরা নকশা হাতে নিয়ে সমুদ্র যাত্রা তো শুরু করেছি, কিন্তু কোথায় যাব সেটাই জানিনা, এই বিষয়টা অনেকটা সেই রকম।

নকশার থেকেও কম্পাস অনেক বেশি জরুরি, যার সাহায্যে আমরা সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারি। এমআইটি মিডিয়া ল্যাবের ডাইরেক্টর জোই ইটো সর্বদা বলেন যে, নকশার চেয়ে কম্পাস অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।তাঁর মতে অনিশ্চিয়তায় ভরা এই পৃথিবীতে কম্পাসই আমাদের সাহায্য করতে পারে। জেফ হোভে তাঁর লেখা বইতে বলেছেন, আপনার কাছে যদি নকশা থাকে তাহলে তা অবশ্যই আপনাকে একটা রোমাঞ্চকর স্থানে নিয়ে যাবে, কিন্তু অনেক সময় সেখানে যাওয়াটা অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়, বাজে খরচ ছাড়া আর কিছুই হয়না, কিন্তু যদি আপনার কাছে কম্পাস থাকে তাহলে আপনি সঠিক স্থানে যেতে পারবেন। এর অর্থ এই নয় যে, লক্ষ্য স্থির করার সাথে সাথে আপনি সঠিক পথে চলতে পারবেন।এর অর্থ হল, আপনাকে এটা ঠিক করতে হবে আপনি কোথায় যেতে চান, তবেই আপনাকে সেই কম্পাস যতটা সম্ভব কম সময়ে সঠিক স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

যেকোনও ব্যবসার ক্ষেত্রে বা কোনও সৃজনশীল কাজ করার সময় এটা জানাটা জরুরি হয়ে ওঠে যে, সেই কাজের থেকে আমরা কী পরিণাম পেতে পারি। তাই যেকোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে আমরা তার থেকে কী পেতে চাই সেটা দেখে নেওয়াটা জরুরি হয়ে যায়।নিম্নে দেওয়া প্রশ্ন গুলি আমরা নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে পারি:

আজ সারাদিনে আমি কী পেতে চাই?

পরের মাসে যে আর্টিকেল প্রকাশিত হবে তার জন্য আমি আজ কত শব্দ লিখেছি?

এই মুহূর্তে আমার দলের লক্ষ্য কী?

যদি এই সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে এই কাজ শেষ করতে হয়, তাহলে কেমন গতিতে আমাকে এই কাজ করতে হবে?

'ফ্লো' খুঁজে পাওয়ার জন্য কাজ শুরু করার আগে স্পষ্ট লক্ষ্য থাকাটা যতটা জরুরি, কাজ শুরু করার পর নিজেকে সেই কাজের হাতে সঁপে দেওয়াটাও ঠিক ততটাই জরুরি। যাত্রা শুরু করার আগে নিজের লক্ষ্যের দিকে ধ্যান দিন, কিন্তু তার জপ করতে থাকার কোন মানে নেই বা তার জন্য বাকি সবকিছু ভুলে যাবেন সেটাও কোনও কাজের কথা নয়।

যখন কোনও খেলোয়াড় অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল পাওয়ার জন্য খেলেন, তখন তাঁর মনে ২৪ ঘণ্টা সেই গোল্ড মেডেল ঝুলবে সেটাই স্বাভাবিক।এই মেডেল কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে, তার বিচার তো মনে আসবেই।কিন্তু সেই সমস্ত বিচার এক কোণে সরিয়ে রেখে বর্তমানকে নিয়েই বাঁচতে হয় তাঁকে।যদি প্রতিযোগিতার সময় তিনি ভাবেন মেডেল পাওয়ার সময় কেমন লাগবে, সংবাদপত্রে তাঁর কেমন ছবি ছাপা হবে, বাবা-মার কেমন লাগবে, বন্ধুরা কী বলবে...তাহলে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টাই তাঁর হাতের বাইরে চলে যাবে।আর এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিচার গুলিই তাঁর পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

লেখকের সাথেও অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে। ধরুন কোনও লেখিকা 'কাদম্বরী' লিখতে চান, এবং তিনি জানেন যে তিন মাসের মধ্যে তাঁকে 'কাদম্বরী' শেষ করতে হবে। তাঁর কাছে তাঁর লক্ষ্য খুবই স্পষ্ট।রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি ঠিক করে নেন, আজ তাঁকে কত পৃষ্ঠা লিখতে হবে।কিন্তু খানিকবাদেই তিনি নিজের লক্ষ্যের কথা ভুলে যান ও বাড়ির কাজে মন দেন বা খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেন।এদিকে এই করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায় অথচ কোনও কাজই ঠিক মতো হয়না, তাতে করে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে যান।তখন তিনি মনে মনে ঠিক করে নেন কাল সকাল থেকে জোড়কদমে শুরু করতে হবে।কিন্তু পরের দিন সকালেও পুনরায় তিনি নিজেকে অন্য কাজে জড়িয়ে ফেলেন ও সময় নষ্ট করতে শুরু করেন। এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকী মাসও কেটে যায়। কিন্তু ওই লেখিকার কাগজে কিছুই লেখা হয়না।

আপনার যদি কাজ জমিয়ে রাখার স্বভাব থাকে, তাহলে সবার আগে হাতে কাগজ-কলম নিয়ে নিন ও প্রথম শব্দটা লিখে ফেলুন। তারপর দ্বিতীয় শব্দ, ধীরে ধীরে তৃতীয়, চতুর্থ লিখতে থাকুন।এইভাবে একটা একটা করে শব্দ লিখতে থাকলে ধীরে ধীরে আপনার কাছে আপনার ইকিগাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।আপনি যদি একবার শুরু করে দেন, যদি ছোট ছোট পায়ে এগোতে থাকেন তাহলে ধীরে ধীরে আপনার চিন্তা আপনার থেকে দূরে সরে যাবে।তারপর আপনি ফ্লো প্রাপ্ত করবেন। আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেন, যারা আনন্দ করতে জানে তারা বর্তমানের মধ্যেই এতটা আনন্দ পেয়ে যায় যে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেই না।

অস্পষ্ট লক্ষ্য:	স্পষ্ট ও ক
আপনি কী করবেন বা কীভাবে করবেন সেই বিষয়টা স্পষ্ট না হলে, কোনও কাজে সফলতা পাবেন কীভাবে?	ফ্লো
মানসিক ব্লক	ফ্লো

উপায় ৩ - একটাই লক্ষ্যের দিকে ধ্যান কেন্দ্রীভূত করুন

আজকের যুগ প্রগতির যুগ, টেকনিকের যুগ, কিন্তু এই টেকনিকের যুগে বেশ কিছু সমস্যা আমাদের পিছু ছাড়েনা।তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, আধুনিক টেকনিকের বশবর্তী হয়ে আমাদের মন প্রায় সময়তেই বিচলিত থাকে, যে কারণে আমরা কোনও একটা জিনিস ধরে রাখতে পারিনা, সেই দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারিনা।ই-মেল লেখার সময় ইউটিউব ভিডিও-তে কী দেখাচ্ছে সেদিকেও চোখ চলে যায়।হঠাৎই মোবাইলে কোনও ম্যাসেজের নোটিফিকেশন'র আওয়াজ কানে আসে, আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই চ্যাটিং করতে।তারপর সেই কাজ সেরে কম্পিউটারে মন দিতেই ফেসবুকের নোটিফিকেশন দেখি ও সেই জগতে হারিয়ে যাই। এইসব কাজে ব্যস্ত হয়ে কোথা থেকে তিরিশ মিনিট চলে যায় বুঝতেই পারিনা, অথচ আমাদের সেই আসল কাজ 'ই-মেল' সেখানেই আটকে থেকে যায়।

বাড়িতেও লোকেরা প্রায় সময়তেই খাওয়ার সময় টিভি খুলে বসে যায়, তাতে করে খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও তরকারির স্বাদ কেমন ছিল তা বুঝেই উঠতে পারেনা। অনেকেই মনে করেন একসাথে যদি একটার বেশি কাজ করা যায় তাহলে অনেকটা সময় বাঁচে।কিন্তু সম্প্রতি এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এর পরিণাম সম্পূর্ণ উল্টো হয়।যারা মনে করেন একসাথে একাধিক কাজ করার বিষয়ে তাদের জুড়ি মেলা ভার, তাদের কার্যক্ষমতা কিন্তু আসলে অন্যদের তুলনায় কম হয়।

একসাথে লক্ষাধিক বিষয় আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, কিন্তু সে খুবই সামান্য বিষয়ের ওপর কাজ করতে পারে।যারা বলেন তারা একসাথে একাধিক কাজ করতে সক্ষম তারা আসলে একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে লাফ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনা।আমরা কম্পিউটার নই, তাই এত দ্রুত একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না।দ্রুততার সাথে একের পর এক কাজ বদলানোর চক্করে আমরা শেষ পর্যন্ত কোনও কাজই ঠিক মতো করে উঠতে পারি না। সেই সাথে আমাদের শক্তি ও সময় দুয়েরই অপচয় ঘটে।'ফ্লো' পাওয়ার জন্য আমাদের একটাই কাজের প্রতি একাগ্রতা রেখে চলতে হবে, সেটা খুবই জরুরি।

সিসিক্সজেনমিহালি মনে করেন একাগ্রতার সাথে যেকোনও কাজ করার জন্য আমাদের দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষ ধ্যান দেওয়াটা খুবই জরুরি:

কাজের জন্য একটা সুন্দর পরিবেশ।

আমরা যে কাজ করছি, তার জন্য মনে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

টেকনোলজি যে মানুষের জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।যতক্ষণ তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার শক্তি অভাবনীয়।কিন্তু যখন তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে তখন তা কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। ধরে নিন আপনি কোনও বিষয়ে কিছু তথ্য একত্রিত করতে চান,আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে কম্পিউটারের সামনে বসে যান তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।কিন্তু আপনি যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারেন, তাহলে কখন নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে অন্য জগতে চলে যাবেন নিজেও বুঝতে পারবেন না।নেটের জালে জড়িয়ে সময় ব্যর্থ নষ্ট করা ছাড়া কিছুই হবেনা। অর্থাৎ যে টেকনোলজি আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারতো, সেটাই আপনাকে লক্ষ্যের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যা।

আজ একটা কথা প্রমাণিত যে, যদি আমরা সর্বদা একটার থেকে আর একটা কাজের দিকে হাত বাড়াতে থাকি তাহলে আমাদের সময় ব্যর্থ হয়, একের পর এক ভুল হয়, কোনও কিছুই আমরা সঠিক ভাবে করতে পারিনা।স্টেনফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিফোর্ড ইভহার নাস নিজের গবেষণার থেকে যে সিদ্ধান্ত লাভ করেছেন তাহল, আজকের প্রজন্ম মাল্টিটাস্কিং-এর ব্যাধিতে পীড়িত। তিনি কিছু ছাত্রদের নিয়ে একটা গবেষণা করেছিলেন, সেই ছাত্ররা একসাথে কটা কাজ করতে পারে, তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাদের কয়েকটা দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন।যে ছাত্রদের মাল্টিটাস্কিং-এর অভ্যাস ছিল, তারা একসাথে কমপক্ষে চারটে কাজ করতো, যার মধ্যে লেখা, বই পড়া, গান শোনা ও স্মার্টফোনে ম্যাসেজের জবাব দেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।তারা এই কাজগুলো তো একসাথে করতোই, কখনও কখনও সেই সাথে নিজেদের টুইটার একাউন্টও চেক করে নিত।

এর ভিত্তিতে তিনি ছাত্রদের চারটি দলে ভাগ করে দেন এবং তাদেরই কিছু কাজ করতে বলেন।তাদের স্ক্রিনে কিছু লাল ও নীল তীর চিহ্ন দেখানো হয়, আর তিনি তাদের সেইগুলি গুনতে বলেন।প্রথমে সব কটা ছাত্র একদম সঠিক উত্তর দেয়, তাদের সেই কাজ করতে কোনও রকম সমস্যা হয়নি। কিন্তু এরপর যখন লাল তীরের সংখ্যা এক রেখে নীল তীরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তখন যে সমস্ত ছাত্ররা মাল্টিটাস্কিং-এ বিশ্বাস রাখে তাদের গুনতে অসুবিধা হয়।(লালা তীরের সংখ্যা একই ছিল, শুধুমাত্র সেই গুলির স্থান বদলে দেওয়া হয়েছিল)।এর কারণ হল, তারা প্রধান কাজের সাথে সাথে অন্যান্য কাজের দিকেও ধ্যান দেয়, আর সেটাই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের মস্তিষ্ককে সেইভাবেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। তাই যখন নীল তীরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তখন তাদের মন বিচলিত হয়ে ওঠে।এই সময় তাদের লালা তীর অদেখা করে নীল তীরের দিকে ধ্যান দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সব কাজের দিকে ধ্যান দেওয়ার যে অভ্যাস তাদের গড়ে উঠেছিল তাই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই সেই কাজ তাদের কঠিন বলে মনে হয়।এতে একটাই প্রধান কাজ ছিল, কিন্তু কী করবে আর কী করবে না সেটা বুঝে উঠতে পারেনা তারা।মাল্টিটাস্কিং-এর অভ্যাস তাদের মুখ্য কাজের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

অন্য আর একটা গবেষণা থেকে এটা জানা গেছে যে, একসাথে একাধিক কাজ করার চেষ্টায় কার্যক্ষমতা ৬০% এবং আইকিউ ১০ পয়েন্ট কমে যায়।সুইডিশ কাউন্সিল ফর ওয়ার্কিং লাইফ এণ্ড সোশ্যাল রিসার্চ নামক একটা সংস্থা এক প্রশিক্ষণ করেছিল, তাতে ২০ থেকে ২৪ বছরের যুবকদের নিয়ে গবেষণা করা হয়।দেখা গেছে যে, স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য তারা কম ঘুমায়, তাদের বন্ধু সংখ্যাও কম, সেই সাথে তাদের ভেতরে একটুতেই বিরক্ত হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি করে দেখা যায়।

-

একই কাজে ধ্যান দেওয়ার লাভ	মাল্টিটাস্কিং-এর কু-প্র
• একাগ্রতার কারণে খুব শীঘ্র 'ফ্লো' লাভ করতে পারে।	• একাগ্রতা, 'ফ্লো' লাভ
• কার্যক্ষমতা বেশি হয়।	• কার্যক্ষমতা ৬০% ক
• নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা সম্ভব হয়।	• কোনও কিছু মনে রা
• ভুল কম হয়।	• ভুল হওয়ার সম্ভাবনা
• কোন রকম বিচলিত ছাড়া শান্তভাবে কাজ করা সম্ভব।	• কাজের উপর কোন
• আশেপাশের লোকেদের সাথে মিলে মিশে কাজ করার জন্য লোকেদের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।	• বেশিরভাগ সময় ফে
• সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।	• সৃজনশীলতা কম হ

'ফ্লো' ও আমাদের মধ্যে এই কারণ গুলি বিরাট অসুখে পরিণত হয়েছে, এই অসুখ দূর করে জন্য আমরা কী করতে পারি? মস্তিষ্কের একাগ্রতা বৃদ্ধির অভ্যাস কীভাবে করা যায়? এখানে কিছু বিষয় দেওয়া হল, যার সাহায্যে একাগ্রতা বৃদ্ধি ও ইকিগাই'র সাহায্যে 'ফ্লো' প্রাপ্তির দিকে যাত্রা করতে পারি:

শোয়ার আগে বা ঘুম থেকে ওঠার পর কোনও রকম স্ক্রিন অর্থাৎ টিভি বা মোবাইলের দিকে দেখবেন না।

যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় নিজের মোবাইলের সুইচ বন্ধ করে দিন, শুধুমাত্র নিজের কাজের দিকে ধ্যান দিন। যদি সম্পূর্ণ রূপে মোবাইল বন্ধ রাখা সম্ভব না হয় তাহলে অযাচিত নোটিফিকেশন যাতে কাজের মাঝপথে এসে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।এতে করে আপনার একাগ্রতার পথে বাধা দেখা যাবেনা ও আপনি নিজের আত্মীয়দের সাথেও যোগাযোগ বজায় রাখতে পারবেন।

সপ্তাহে একটা দিন শনিবার হোক বা রবিবার টেকনোলজির উপবাস করতে শিখুন।

এমন কোনও ক্যাফেতে যান, যেখানে ওয়াইফাইয়ের সুবিধা থাকবেনা।

সারাদিনে এক থেকে দুইবার নিজের ই-মেল চেক করুন ও তার জবাব দিন।আগে থেকেই ঠিক করে নিন, কোন সময় আপনি এই কাজটা করবেন, আর তখনই সেটা করুন।

পোমোডোরো টেকনিকের ব্যবহার করুন।নিজের জন্য পোমোডোরো (পোমোডোরো বা টমেটোর মতো দেখতে) কিচেন টাইমার নিয়ে আসুন।কোনও একটা সময় ক্রমাগত একটাই কাজ করুন।টেকনোলজি বলে, আপনি যদি ২৫ মিনিট ক্রমাগত কাজ করেন তাহলে ৫ মিনিট বিশ্রাম নিন।৫০ মিনিট কাজ করতে ১০ মিনিট আরামের জন্য বরাদ্দ করুন।আপনি কতটা সময় আরাম করছেন সেটা কথা নয়, কথা হল আপনি যে সময়টা নির্ধারণ করছেন সেটা মেনে চলতে পারছেন কিনা দেখুন।

নিজের পছন্দের কোনও কাজ দিয়ে শুরু করুন।

যখন মনে হবে আপনার মন একাগ্র হতে পারছেনা, তা কোথাও হারিয়ে গেছে, তখন নিজের মনকে বর্তমানে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।মাইন্ডফুলনেস বা এই রকম কোনও ধ্যান পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন।হাঁটুন, সাঁতার কাটুন, এই ধরনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন।

এমন স্থানে কাজ করুন, যাতে আপনার মন বেশি বিচলিত হতে না পারে।আপনার বাড়িতে যদি এমন কোনও শান্ত স্থান না থাকে তাহলে লাইব্রেরি বা কোনও ক্যাফেতে গিয়ে বসতে পারেন।যতক্ষণ না মনের মতো কোনও স্থানের সন্ধান করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আদর্শ স্থানের খোঁজ চালিয়ে যান।

কাজের প্রকৃতি অনুসারে তা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিন।প্রতিটা কাজের জন্য আগে থেকেই সময় ও স্থান নির্ধারণ করে নিন। মনে করুন আপনি কোনও ম্যাগাজিনের জন্য কিছু লিখবেন বলে ঠিক করেছেন, তার জন্য সকালে ঘরে বসে নোটস লিখুন, দুপুরে লাইব্রেরিতে বসে আর্টিকেল লিখুন ও সন্ধ্যার সময় তার সম্পাদনার কাজ সেরে নিন।

বিল জমা করা, ফোন করা এবং ই-মেল করার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে রাখুন এবং সেই সময়তেই এই কাজ করুন।

কাজের মধ্যে ডুবে (ফ্লো) থাকলে কী লাভ হয়	মন বিচলি
• একাগ্র মন।	• বিচলিত
• বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকা।	• মন অতী

- চিন্তামুক্ত জীবন।
- কাজ করার সময় কীভাবে সময় কেটে যায় বোঝা যায়না।
- সর্বদা মনে হয়, প্রতিটা বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।
- পরিকল্পনা অনুসারে আমরা এগিয়ে যাই।
- আমরা কোনও কাজ কেন করছি তার কল্পনা করি এবং একাগ্রতার সাথে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারি।
- আমাদের মন সমস্ত সমস্যা অতিক্রম করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।
- অহংকার শেষ হয়।
- 'আমি এই কাজ করতে পারি'-র বদলে 'এই কাজ আমি করতে পারছি' এমন বোধের জন্ম হয়।

- আমাদে
- কাজ ক
- কাজ অ
- কোন র
- কাজ ক
- শঙ্কা, চি
- ক্লান্তি
- প্রতিটা

জাপানে 'ফ্লো': টাকুমিস, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক এবং ওটোকিস

টাকুমিস অর্থাৎ শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক এবং ওটোকুস-এর মধ্যে কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়? এরা সকলেই ইকিগাই-এর মাধ্যমে 'ফ্লো'-তে থাকার কী গুরুত্ব তা বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

কথায় আছে, জাপানের লোকেরা নাকি খুবই কষ্ট সহিষ্ণু হয়। তারা নিজেদের কাজের প্রতি সমর্পিত করে কাজের মধ্যেই ডুবে যায়।যদিও জাপানের লোকেরা বলে তারা বেশি কষ্ট করেনা, তবে সামনের মানুষদের সেটার পরিবর্তে উল্টোটাই মনে হয়।তারা মুখে যাই বলুক না কেন, যেকোনও কাজ তারা যতটা মন-প্রাণ ঢেলে করে বা যেকোন সমস্যার থেকে যেভাবে বেরিয়ে আসে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।জাপানিদের যখন ভাষা শিক্ষা শুরু হয়, তখন তারা প্রথম যে শব্দটা শেখে তাহল 'গংবারু'। এর অর্থ হল, কাজে হাত দেওয়ার পর ক্রমাগত সেই কাজ চালিয়ে যাওয়া।

ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কাজও জাপানিরা খুবই মন-প্রাণ দিয়ে করার চেষ্টা করে।কাজ করার সময় কাজ ছাড়া তাদের মনে আর কোন কথাই থাকে না।অবসর গ্রহণের পরেও জাপানিদের ক্ষেতে গিয়ে কাজ করতে দেখা যায়, ছুটির দিনেও তারা ঘরে বসে আরাম করেনা, বরং বিভিন্ন দোকানে গিয়ে কাজ করে, এমনকী সেখানকার ছাত্রদেরও ছুটির দিনে দোকানে কাজ করতে দেখা যায়। প্রত্যেকের মনে কাজের প্রতি যে আস্থা আছে, তা তাদের দেখলেই বোঝা যায়।

জাপানের নাহা, কানঝাওয়া বা কয়োটা-তে গেলে আপনার মনে হবে আপনি কোনও হস্তশিল্পের ভাণ্ডারে এসে পড়েছেন। সেখানকার যেকোনও হস্তশিল্পের দোকান দেখলে আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না। টেকনলজির ক্ষেত্রেও জাপান উন্নতির চরমে পৌঁছে গিয়েছে।একদিকে টেকনলজি জাপানকে যেমন বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে অন্যদিকে তেমন হস্তশিল্পের মাধ্যমে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

টাকুমির শিল্প:

টয়োটাতে এমন কিছু কারিগর আছে যাদের হাতে জাদুর কাঠি আছে।তারা নিজেদের হাতে যেগুলি বানায় তা অন্য কাউর পক্ষে সম্ভব না, কার্যকুশলতার দিক থেকে তাদেরকে এক কথায় অসাধারণ বলা চলে।বিশেষ কিছু কাজে কিছু লোক এতটাই নিপুণ হয় যে, তাদের দেখলে মনে হয় নতুন প্রজন্ম কিছুতেই তাদের সেই স্থান নিতে পারবে না।

টর্নটেবিলের কাঁটা এমন এক জিনিস যা শুধুমাত্র জাপানের মানুষরাই বানাতে পারে।আজও ওই কাঁটা তৈরির জন্য যে প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা হয় সেই কার্যকুশলতায় খুব কম লোকের সাহায্যেই এই কাজ করা সম্ভব হয়।

যখন আমরা কুমানো নামক একটা ছোট্ট গ্রামে যাই তখন আমাদের সাথে টাকুমিদের সাক্ষাৎ হয়। মেকআপের জন্য যে ব্রাশ ব্যবহার হয়,তার প্রস্তুতকারক বড়ো ব্যান্ডের জন্য শুটিং-এর উদ্দেশ্যে আমরা ওখানে গিয়েছিলাম।আমরা সেখানে পৌঁছাতেই খরগোশের মতো একটা বড়ো প্রাণী হাতে ব্রাশ নিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়। চারপাশে বেশ কিছু মন্দির ও বাগান ছিল, যা সেই পরিবেশকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

বেশ কিছু লোককে একসারিতে বসে কাজ করতে দেখা যাচ্ছিল, আমরা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাদের ফটো তুলি। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কেউ ব্রাশে রঙ করছিল তো কেউ প্রস্তুত ব্রাশগুলি গাড়িতে তুলছিল।কিন্তু কাজ গুলি লক্ষ্য করার পর আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারি যে ব্রাশের সামনে যে চুলের মতো অংশ থাকে তা লাগানোর কাজ কিন্তু কেউই করছিল না।

আমরা সেই বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহ দেখাই, অনেকের সাথে এই নিয়ে কথা বলি, বিভিন্ন লোককে প্রশ্ন করার পর সেই কম্পানির এক সভাপতি আমাদের কীভাবে ওই কাজ সম্পন্ন হয় তা জানাতে রাজি হন। তিনি আমাদের কারখানার বাইরে গিয়ে গাড়িতে বসতে বলেন। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের গাড়ি একটা ছোট্ট ঘরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়, একটা ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াই আমরা।ঘরের মধ্যে ঢোকার পর আমরা দেখতে পাই, সেই ঘরে অনেক গুলি জানলা আছে, আর সেই জানলা দিয়ে প্রকৃতির আলো প্রবেশ করছে ঘরের মধ্যে।

ওই ঘরের মাঝখানে এক মহিলা এমন এক মুখোশ পরে বসেছিলেন যে, আমরা শুধুমাত্র তাঁর চোখটাই দেখতে পাচ্ছিলাম। ভালো করে লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারি, ওই মহিলা ব্রাশের জন্য একটা একটা করে চুল জোগাড় করছিলেন, তাঁর কাছে কাঁচি বা সেই ধরনের কিছু যন্ত্রপাতি ছিল, সেই গুলির সাহায্যেই তিনি কাজ করছিলেন। ওই চুলের কোয়ালিটি অনুসারে তিনি সেগুলি বাছ ছিলেন, তিনি নিজের কাজ নিয়ে এতটাই বিভোর ছিলেন যে, আমাদের আসার কথাটা তিনি বুঝতে পর্যন্ত পারেননি। খুব ভালো করে দেখার পর বুঝতে পারি, তিনি যে গতিতে কাজ করছিলেন তাতে করে আমাদের পক্ষেই তিনি কী করছেন তা বোঝা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

কম্পানির সভাপতি আমাদের আসার কথা তাঁকে জানান, এমনকী তিনি এটাও বলেন যে আমরা তাঁর ছবি নিতে এসেছি। তখন তাঁর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম কথাটা শোনার পর তিনি কতটা খুশি হয়েছেন।আমরা তার মুখ দেখতে পারিনি ঠিকই কিন্তু চোখের ভাষা তাঁর খুশির কথা বলে দিয়েছিল।তাঁর কণ্ঠস্বরেও ছিল খুশির প্রকাশ। তিনি নিজের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে কথা বলছিলেন।তাঁর হাতের গতি ক্যামেরা বন্দি করার জন্য আমাদের বেশকিছু ফাস্ট শটরের ব্যবহার করতে হয়েছিল।তাঁর হাতের গতি ও যন্ত্রের ব্যবহার দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কম্পানির সভাপতির থেকে আমার সেই ঘরের বিশেষত্ব সম্পর্কে জানতে পারি, কেন তাঁকে সেই ঘরে রাখা হয়েছিল তাও জানতে পারি।আসলে তিনি ছিলেন ওই কম্পানির বড়ো একজন কারিগর, প্রতিটা ব্রাশ তাঁর হাতেই তৈরি হত।

স্টিভ জবসের জাপান ভ্রমণ:

এপেলের সহ-সংস্থাপক স্টিভ জবসের জাপান খুবই প্রিয় জায়গা।১৯৮০ সালে তিনি একবার 'সনি' কম্পানি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি যখন 'এপেল’ গড়ে তোলেন তখন তিনি 'সনি' কম্পানির বহু কার্য প্রণালী গ্রহণ করেন। জাপানের সরল জীবন যাত্রা ও সিরামিকের তৈরি বাসনপত্র তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল।

ইউকিও শাকুনাগা নামক শিল্পী তোয়ামাতে থাকতেন, তিনি তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন।এই শিল্পীর জানা ইত্চু সেতোয়াকি নামক কলা সম্পর্কে খুব কম লোকেরাই অবগত ছিলেন।জবস যখন সেখানে ছিলেন তখন তিনি শাকুনাগা সম্পর্কে জানতে পারেন।তিনি বুঝেছিলেন যে, পোর্সেলেনের বাসন সম্পর্কে তিনি অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারবেন। সেখানে থেকে তিনি কাপ ডিস সহ বেশ কয়েকটি জিনিস কেনেন।এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি তিনবার সেখানে যান।

এই প্রেরণার সন্ধান করার জন্য জবস বেশ কয়েকবার জাপানে গিয়েছিলেন।তিনি শাকুনাগার সাথে দেখা করেন।তিনি ওই বাসন সম্পর্কে ও তা কীভাবে বানানো হয় তা নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন।আসলে তিনি কোন পদার্থের ব্যবহার করেন

সেটা জানার ইচ্ছা ছিল তাঁর।শাকুনাগা তাঁকে জানান যে, তিনি সাদা রঙের পোর্সলেন মেটেরিয়াল ব্যবহার করেন, তা তিনি পাহাড় থেকে খুঁজে নিয়ে আসেন।এইভাবে মেটিরিয়াল খুঁজে এনে বাসন তৈরি করার মতো শিল্পী তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

এই কথা শুনে জবস এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি ওই পাহাড় দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেখানে সেই মেটিরিয়াল পাওয়া যেত।যে পাহাড় থেকে তিনি সেই জিনিসটা নিয়ে আসতেন তা ছিল অনেক দূরে, এই কথা শুনে জবস আরও অবাক হয়ে যান।সেই পাহাড়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে ট্রেনে করে চার ঘণ্টা যেতে হত।

শাকুনাগার সাথে জবসের মৃত্যুর পর দেখা হয়েছিল, তিনি বলেন, "যে মানুষটা এমন একটা মোবাইল কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তিনি যে আমার কাজের এত কদর করেছিলেন, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে সম্মানের।"তিনি জানান যে, জবস তাঁর কাছ থেকে ১২ টা কাপের একটা সেট কিনেছিলেন। যাতে জবসের পছন্দ হয় তার জন্য শাকুনাগা ১৫০ রকম কাপ বানিয়েছিলেন, তার মধ্যে থেকে জবসের যেটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ ছিল তারই ১২টা তিনি বানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জন্য। জাপান থেকে ঘুরে যাওয়ার পর জবস জাপানের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিংস (বিশেষ করে ডোসানির), দার্শনিক (জৈন), এবং খাদ্য-সংস্কৃতির (সুশি)।

অত্যাধুনিক সরলতা:

এবার একটা বিষয় ভেবে দেখুন, জাপানের ইঞ্জিনিয়ারিং, জৈন দার্শনিক ও খাদ্য সংস্কৃতির মধ্যে কোনও সাদৃশ্য আছে কী? আর যদি থাকে, তাহলে সেটা কী?এর উত্তর হল সরলতা এবং লক্ষ্য।অলসতার কারণে এই সরলতার জন্ম হয়নি।এই সরলতার জন্ম হয়েছে আধুনিকতার থেকে। প্রত্যেকে নিজের ইকিগাই অনুসারে মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করে এবং তাদের এই একাগ্রতাই তাদের বিকাশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

সিসিক্সজেনমিহলি-র হিসাবে আমার যদি সর্বদা 'ফ্লো'-তে থাকতে চাই তাহলে কোন না কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের সামনে সর্বদা থাকাটা খুবই জরুরি।

'জিরো ড্রিমস অফ সুশি' নামক সিনেমায় টাকুমির আর একটা উদাহরণ দেখানো হয়েছে।এই সিনেমায় যে উদাহরণ দেখানো হয়েছে তার সাথে আমাদের রান্নাঘরের সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে।এই সিনেমার মুখ্য চরিত্রের নাম ছিল জিরো, টোকিওতে এক স্টেশনসের কাছে তাঁর একটা ছোট্ট সুশির রেস্টুরেন্ট ছিল।বিগত আশি বছর ধরে ওই রেস্টুরেন্টে জিরো ও তার ছেলে 'সুশি' বানাতো।তারা দুজনে মিলে প্রতিদিন কাছের একটা বাজার থেকে ভালো দেখে মাছ নিয়ে আসতো।

জিরোর কাছে এক ছাত্র আসতো এবং সে তার কাছে থেকে টামাগো (একধরনের মোটা মিষ্টি অমলেট) বানানোর প্রশিক্ষণ নিতো।সে অনেক চেষ্টা করতো সেই টামাগো বানানোর কিন্তু কিছুতেই জিরো তার কোনও প্রশংসা করতো না।কিন্তু তার জন্য সে পিছপা হয়নি, বরং আরও চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত একদিন জিরোর প্রশংসা লাভ করেই ছাড়ে।

এই ছাত্র চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিল কি? প্রতিদিন একই অমলেট বানাতে তার বিরক্ত লাগতো না? না। কারণ সুশি বানানো ছিল তার ইকিগাই।জিরো এবং তার ছেলে এই ব্যাপারে নিপুন ছিল, খাবার বানানোর বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনও রকম বিরক্তি ছিলনা।আসলে এই কাজের ব্যাপারে তাদের মধ্যে 'ফ্লো' ছিল এবং সেই কারণে তারা দুজনেই ওই কাজে মগ্ন হয়ে যেত।

রান্নাঘরে তারা খুবই আনন্দের সাথে কাজ করতো, আসলে সেটাই ছিল তাদের ইকিগাই। কাজ করার সময় তারা দুজনেই এতটা খুশিতে থাকতো যে, কত সময় হয়েছে তাও খেয়াল করতো না।

পিতা-পুত্রের কাজের বিষয়ে খুবই একাগ্রতা ছিল,তার পিছনে যে কারণটা কাজ করতো তাহল তাদের কাজের পরিবেশ ছিল খুবই শান্ত।এই কাজের জন্য তারা বহু প্রশংসা লাভ করেছে, সেই সঙ্গে পুরস্কারও পেয়েছে।এমনকী তিন তারা যুক্ত নামাঙ্কনও লাভ করেছিল তারা, কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা কখনই নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির কথা ভাবেনি বা রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় কোন শাখা খোলার পরিকল্পনাও ছিল না।তারা নিজেদের ছোট্ট হোটেলে দশ জন লোকের খাবার বানিয়েই খুশিতে থাকতো, জিরোর পরিবার কখনই অনেক বেশি উপার্জনের কথা ভাবেনি।তারা সর্বদাই শান্ত, আনন্দদায়ক এবং খুশিতে ভরা পরিবেশে কাজের কথা ভেবেছে, সেই কারণেই তারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশি বানাতে সক্ষম হয়, এবং কখনই তাদের জীবনে 'ফ্লো'-র ঘাটতি ঘটেনি।

জিরোও ইউকিও শাকুনাগার মতো মালের কোয়ালিটির দিকে বিশেষ নজর দিত।প্রতিদিন সকালে সে নিজে বাজারে যেত সবচেয়ে ভালো মাছটা কেনার জন্য, যেমনটা শাকুনাগাও করতেন, নিজের হাতে পাহাড় থেকে মেটিরিয়াল নিয়ে আসতেন। নিজের কাজ শুরু করার মানে হল তিনি 'ফ্লো'-তে কাজ করতেন, জাপানে এই বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, অর্থাৎ কাজের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া।শিন্টোইঝম মনে করেন গাছ, জঙ্গল বা প্রাকৃতিক বস্তু নিয়ে কাজ করার মানে হল ঈশ্বরের সাথে কাজ করা, কারণ এর মধ্যেই ঈশ্বর অবস্থান করেন।

প্রতিটা মানুষ, সে কোনও শিল্পী, দার্শনিক না ইঞ্জিনিয়ার যাই হোক না কেন, তার উচিত এই চৈতন্যের সাথে মিলেমিশে কাজ করা এবং নিজের কাজকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা। এই কারণেই তো শিল্পী নিজের কলার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে, এর সাহায্যেই সে কার্যমগ্ন হতে পারে।যে লোহা দিয়ে কাজ করে তাকে লোহার ভেতরের গুণ আবার যে সিরামিক দিয়ে কাজ করে তাকে মাটির ভেতরের গুণ বুঝে নিয়ে তার সাথে একাত্ম হতে হবে এবং সেই অনুসারেই নিজের কাজ করতে হবে। আসলে জাপানিরা কীভাবে প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন করতে হয়, তা খুবই ভালো করে জানে।তারা কখনই প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধ্যে যুদ্ধ লাগায় না বরং তাদের মেলবন্ধনের সাহায্যে নিজেরা আরও লাভবান হয়।

ঘিবলি-র শুদ্ধতা

আজকাল কিছু মানুষ মনে করেন যে, শিন্টোর প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।ওর সবচেয়ে সাহসী ও বড়ো সমালোচক হল হায়াও মিয়াঝাকি, তিনি ষ্টুডিও ঘিবলি-র সাহায্যে অনেক গুলি এনিমেটেড ফিল্ম তৈরী করেছেন। তাঁর কাছে নিজের ইকিগাই খুবই স্পষ্ট ছিল।তাঁর তৈরি প্রায় প্রতিটা ফিল্মেই মানুষ, তন্ত্রজ্ঞান, অসম্ভব কল্পনা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা গিয়েছে।শুরু-তে একে অপরের সাথে লড়াই করলেও শেষে গিয়ে সবাই এক হয়ে যায়।'স্পিরিটেড ওয়ে' নামক ফিল্মে তিনি এমন এক স্পিরিটের কল্পনা করেছেন যার সাহায্যে তিনি নোংরা আবর্জনার সাহায্যে নদীতে হওয়া দূষণের দিকে আলোকপাত করিয়েছেন।

মিয়াঝাকির ফিল্মের বিশেষত্ব হল, জঙ্গল ও মানুষ।তাঁর সৃষ্ট গাছেরও আবেগ থাকে, তাঁর তৈরি রোবটের সাথে গাছের বন্ধুত্ব হয়।দেশের সম্পদ হিসাবে পরিচিত মিয়াঝাকি নিজের কল্পনার জগতেই বিচরণ করেন, নিজের শিল্পের মধ্যেই ডুবে থাকেন তিনি।১৯৯০ সালে সৃষ্ট সেলফোনের বুভার করেন তিনি, এবং তিনি তাঁর দলের লোকেদের হাত দিয়ে ছবি তৈরি করার প্রেরণা দেন।তিনি কাগজ ও পেনের সাহায্যেই নিজের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করেন।কোনও রকম কম্পিউটারের ব্যবহার হয় না এই ঘিবলি ষ্টুডিও-তে, আজও তা নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখে, নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছে।এই শ্রেয় দেওয়া হয় পথ প্রদর্শক মিয়াঝাকিকে।যারা নিজে চোখে ঘিবলি ষ্টুডিও দেখেছে তারা সেখানকার রবিবারের দৃশ্য সম্পর্কে অনেকটাই ওয়াকিবহাল।আপনি যদি কোনও রবিবার সেই ষ্টুডিও-তে যান তাহলে সেখানকার কোনও একটা

কোণায় অতি সাধারণ পোশাকে এক ব্যক্তিকে বসে কাজ করতে দেখবেন। তিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকেন, আর আপনার দিকে না তাকিয়েই আপনাকে 'ওহায়ো' (হ্যালো) বলে সম্ভাষণ করবেন।

মিয়াঝাকি কাজ করতে এতটাই ভালোবাসেন যে, রবিবার দিন আরাম না করে কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, ওই কাজের 'ফ্লো'-র মধ্যেই তিনি নিজের আনন্দ খুঁজে নেন।তিনি সারাক্ষণ নিজের ইকিগাই নিয়েই কাটিয়ে দেন, ওখানে আসা কোনও লোক মিয়াঝাকি-কে কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে দেখেনি।২০১৩ সালে মিয়াঝাকি অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর স্মরণে এনএইচকে টেলিভিশন একটি তথ্যপূর্ণ ফিল্ম তৈরি করবে বলে ঠিক করে, তাতে তাঁর অবসর নেওয়ার আগের কয়েকটি দিনের ছবি তুলে ধরা হয়েছিল।তাতে দেখানো হয়, বেশ কিছু লোক ঘোরাঘুরি করছে, কেউ কেউ মিটিং নিয়ে ব্যস্ত কিন্তুমিয়াঝাকি এক কোণায় বসে নিজের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছেন।একটা দৃশ্যে ৩ ডিসেম্বরের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল, সেদিন সারা জাপান ছুটির আনন্দে মেতে থাকলেও মিয়াঝাকি নিজের ষ্টুডিও খোলেন ও কাজ করেন।

মিয়াঝাকির ভেতরে কাজ করার যে প্রবণতা ছিল তা তিনি কিছুতেই রোধ করতে পারেননি।যেদিন তিনি অবসর নিয়েছিলেন তার পরের দিনও তিনি ষ্টুডিও-তে আসেন ও এক কোণায় বসে নিজের কাজ করে যান।বাকি লোকেরা বুঝতে পারছিল না তিনি কী করছেন! তারা একে অপরের মুখ দেখতে থাকেন।এই ঘটনার এক বছর বাদে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি ফিল্ম বানানো বন্ধ করছেন কিন্তু সারা জীবন ছবি আঁকবেন তিনি।কোনও মানুষ যদি এইভাবে নিজের কাজকে ভালোবাসে তাহলে সে কোনও দিন অবসর নিতে পারবেনা।

একান্তবাস

এমন ধরনের মানুষরা শুধু যে জাপানেই বাস করেন, তা নয়।এমন বহু শিল্পী, পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ আছেন যাঁরা জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত কাজ করে যান।আইনস্টাইন মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগেও একটা সূত্র লিখেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত বল-কে কীভাবে একত্রিত করা যেতে পারে।জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেই কাজই করে গেছেন যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিত। তিনি বলতেন, আমি যদি বিজ্ঞানী না হতাম তো কোনও সংগীতকার হতাম।তিনি যখন অংক বা ভৌত-বিজ্ঞানের জগতের বাইরে থাকতেন তখন তিনি ভায়োলিন বাজাতেন।একদিকে সূত্রের সন্ধান, অন্যদিকে সংগীতের রসই ছিল তাঁর জীবনের ইকিগাই। এই দুটি কাজেই তিনি অসাধারণ আনন্দ পেতেন।

অনেক সময় এই ধরনের মানুষদের সম্পর্কে অনেকেই ধারণা করেন যে, 'এরা অন্যদের সাথে মিশতে পারেনা' বা 'এরা একা থাকতে ভালোবাসে'।আসলে লোকেদের সাথে কথা বলার বদলে নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই বেশি ভালোবাসে এরা।এই ধরনের মানুষেরা নিজেদের ফ্লো-তে থেকে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে জানে।

এর আর এক জীবন্ত উদাহরণ হল কাদম্বরিকার হারুকি মুরাকামি।তাঁর বন্ধু সংখ্যা ছিল খুবই কম, আর দু-চার বছরে একবার তাদের সাথে দেখা করতেন।আমরা যদি সর্বদা ফ্লো-তে থাকতে চাই, নিজেদের ইকিগাই লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের আশেপাশের পরিবেশ অবশ্যই শান্ত ও সুরিক্ষিত হতে হবে, নিজেকে সমস্ত রকম সমস্যার বাইরে রাখতে হবে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে মাথায় রাখবেন।

মাইক্রো ফ্লো: প্রতিদিনের কাজ থেকে পাওয়া আনন্দ

কোনও রকম শৈল্পিক কাজ থেকে আনন্দ পাওয়াটা খুবই সহজ বিষয়, কিন্তু প্রতিদিন আমাদের যে কাজ গুলি করতে হয়, যেমন ধরুন ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা বা জামা-কাপড় কাচা ইত্যাদির থেকে আমরা কীভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারি?প্রতিদিনের এই একঘেয়ে কাজের মধ্যে থেকে সত্যিই কি আনন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

শিঞ্জুকুর সবভে স্টেশনের সুপার মার্কেটে এক ব্যক্তিকে লিফটম্যানের দায়িত্বে রাখা হয়।এমনিতে সেখানকার লিফটগুলি চালনা করা খুবই সহজ হয়, তাই গ্রাহকেরা নিজেরাই এর ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র যাতে গ্রাহকদের লিফটের দরজা খোলা-বন্ধ না করতে হয় তার জন্য মালিকেরা লিফটম্যান রাখে।কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই ধরনের একঘেয়ে কাজ করতে কার ভালো লাগবে?তার ভেতরে বিরক্তির জন্ম হবেনা? কিন্তু আপনি যদি তার কাজের দিকে খেয়াল করেন তাহলে বুঝবেন, সে শুধুমাত্র একটা বোতাম টেপে না, বরং একটা শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ কাজটা করার চেষ্টা করে।যখনই কোন ব্যক্তি লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তখনই সে খুব হালকা ও মিষ্টি স্বরে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে তাকে স্বাগত জানায়।তারপর তাকে ভেতরে আসতে বলে, নিজেস্ব সুন্দর ভঙ্গিতে বোতাম টেপে।একেই সিসিক্সজেনমিহালি 'মাইক্রোফ্লো' বলেছেন।

অনেক সময় ক্লাস করতে করতে, কোন সভায় বসে বা কোনও কাজ করার সময় আমাদের একঘেয়ে লাগে, তখন আমরা মনোরঞ্জনের উপায়ের সন্ধান করি।দেওয়াল রঙ করার সময় সিটি বাজিয়ে সুর তুলতে দেখা যায়।কোনও কাজ যতক্ষণ না আমাদের ভেতরে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই কাজে ডুবে যেতে পারিনা।নিজেকে ছোট ছোট কাজের মধ্যে মগ্ন করে দিন, এটাই মাইক্রোফ্লো প্রাপ্ত করার সবচেয়ে ভালো উপায়।তাতে করে আমরা প্রতিদিনের কাজ গুলিও খুবই খুশি মনে করতে পারি।

বিল গেটস প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বাসন ধোন।তাঁর মতে এতে মন শান্ত ও শুদ্ধ হয়, তাই বাসন মাজতে তিনি খুবই পছন্দ করেন।শুধু তাই নয়, কাল যেভাবে বাসন ধুয়েছিলেন আজ তার থেকে আরও ভালো করে বাসন ধোয়ার চেষ্টা করেন তিনি। বাসন মাজার জন্য তিনি একটা কার্যপ্রণালী গড়ে তুলেছিলেন, তিনি প্রথমেই থালা মাজেন, তারপর চামচ আর তারপর বাকি বাসন গুলি, এটি তাঁর মাইক্রোফ্লো পদ্ধতি।

মহান ভৌত বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেয়রম্যান দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেতেন।সুপারকম্পিউটারের জনক ডব্লিউ. ড্যানিয়েল হিলিস যখন ফেয়রম্যানকে কাজে রেখেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁকে প্রতিদিন কী কী কাজ করতে হবে।আসলে সেই সময় ফেয়রম্যান যাদের কাছে কাজ খুঁজতে গিয়েছিলেন, তারা কেউই তাঁর পছন্দের কাজ দিতে পারছিল না। ডব্লিউ. ড্যানিয়েল হিলিস-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি তাঁকে কয়েকটি অংকের সমাধান করতে দেন, কিন্তু সেই কাজ তাঁর পছন্দ হয়না, তিনি বলেন, "আপনি আমাকে এমন কিছু কাজ দিন, যাতে সত্যিই কিছু লাভ হয়।"

তখন ডব্লিউ. ড্যানিয়েল হিলিস তাঁকে অফিসের পাশের দোকান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসতে বলেন।সেই কাজ তিনি খুশি মনে হাসতে হাসতে করেন।ফেয়রম্যানের কাছে যখন কোনও কাজ থাকতো না, তখন তিনি মাইক্রোফ্লো-তে চলে যেতেন, অনেক সময় তাঁকে অফিসের দরজা রঙ করতে পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। কিছুদিন বাদে ওই অফিসে কিছু নিবেশক আসেন, সেখানে এসে তাঁরা বলেন, "আপনাদের অফিস যে রঙ করেছে, তাকে তো নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত!"

ধ্যানের পথ থেকেই শান্তির সন্ধান:

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা শীঘ্রই ফ্লো-র অবস্থায় পৌঁছাতে পারি, মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল ধ্যান।এটা ঠিক যে, ধ্যানের বহু পদ্ধতি আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই, আর তাহল মনকে শান্ত করা, বিচার করে দেখা,

আবেগকে বোঝা এবং নিজেকে একই স্থানে কেন্দ্রিত করে রাখা।সাধারণত সোজা হয়ে বসে নিজের শ্বাসবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই হল আসল প্রক্রিয়া।এটা যে কেউ করতে পারে। একবার তা করতে পারলে আপনি নিজের থেকেই একটা পরিবর্তন অনুভব করতে পারবেন। যে শ্বাসবায়ু প্রতিনিয়ত আপনার ভেতরে যাচ্ছে ও বাইরে বেরিয়ে আসছে তার মাধ্যমেই আপনি নিজের ভেতরের উথাল-পাথালকে শান্ত করতে পারেন, আর তাতে করে যেকোনও সমস্যাও আপনার কাছে অনেক হাল্কা বলে মনে হবে।

ধনুর্ধরের রহস্য

সাল ১৯৮৮, সেই বছর অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তিরন্দাজি-র স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন ১৭ বছরের দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড়।যখন তাঁর কাছ থেকে এই সফলতার পিছনে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল তখন তিনি বলেন, "এর শ্রেয় আমি ধ্যানকে দেব।" তিনি জানান, প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ব্যায়াম করতেন, যা তাঁর প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

আমরা যদি ফ্লো-তে পৌঁছাতে চাই, তাহলে তার সবচেয়ে ভালো উপায় হল ধ্যান (মেডিটেশন)।যারা নিজেদের স্মার্টফোন ও নোটিফিকেশনের জালে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাদের জন্য এটা হল সর্বোত্তম উপায়।

যারা ধ্যান শুরু করেন তারা দ্রুত পরিণাম পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে ওঠেন, আর এটা তাদের জন্য এক বিরাট বড়ো ভুল। তারা অতি দ্রুত নির্বাণ অবস্থায় পৌঁছাতে চায়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল ধ্যান মানে আনন্দ উপভোগ করা। মন বিভিন্ন বিচার, কল্পনা ও আবেগের সমুদ্র। এই সবকিছু মিলে মিশে একটা ঝড়ের সৃষ্টি হয়। ধ্যানের মাধ্যমে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমরা সেই ঝড়কে শান্ত করতে পারি, আমরা ভেতর থেকে শান্তি অনুভব করি ও জীবন এক নতুন স্পষ্টতা লাভ করে।

'আমাদের ভেতর যে বিচারই আসুক না কেন, তার জন্য মানসিক চাপের মধ্যে থাকা উচিত না" ধ্যানের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টা শিখতে পারি।কাউকে কষ্ট দেওয়া, মারা বা ঝগড়া করার মতো নেগেটিভ বিচারের জন্ম আপনার মনে হতেই পারে, কিন্তু এই ধরণের বিচারগুলিকে কখনই মনের ভেতরে চেপে বসতে দেবেননা, 'এটা তো একটা মনের ভাব' এই ধরনের তকমা সেঁটে এমন বিচারের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।সারাদিনে মনে যে ষাট হাজার বিচার আসে, তার মধ্যে এইগুলিও আসে, তবে তা নিজের উপর চেপে বসতে দেবেন না, সেইগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করুন।

মানুষ ধার্মিক জীব

আমাদের সারাটা জীবন ধর্মের সূত্রেই গাঁথা থাকে।কিছু মানুষ মনে করে মানুষ শুধুমাত্র নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য ধর্মের আশ্রয় নেয়।কিন্তু আসলে ধর্মের পালন করা মানুষের মূল স্বভাবের মধ্যেই পড়ে।যদিও আধুনিক জগতে মানুষ ধর্ম পিছনে ফেলে ভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য'র খোঁজেই জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, মানুষ শিকার করা,খাবার বানানো, চাষাবাদ করা, গবেষণা করা এবং নিজের পরিবার নিয়েই ব্যস্ত থাকতো, তাই ব্যস্ত থাকা মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।আগেকার দিনের মানুষেরা এর মধ্যেই নিজেদের জীবনকে সীমিত রেখেছিল কিন্তু বর্তমান দিনে মানুষ প্রগতির জালে জড়িয়ে ভৌতিক বস্তুর পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে।

জাপানের মানুষরা আজও নিজেদের ধর্ম ও দৈনিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে সক্ষম। জাপানে কনফুসিয়ানিজম,বৌদ্ধ ধর্ম এবং শিন্তোইজমের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তবে নিয়মের থেকে ধর্মের গুরুত্ব বেশি।আপনি যদি

জাপানে কোনও কাজ করেন তাহলে আপনি কী কাজ করছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি কীভাবে কাজটা করছেন।তা দেখা কোনও কম্পানির জন্য ভালো না মন্দ তা নিয়ে আলোচনা করা এই পুস্তকের বিষয় না।তবে কোনও কাজ করার সময় মাথায় বসের ভয় থাকা বা মানসিক চাপের থেকে ধর্মের পথে ফ্লো'র মাধ্যমে কাজ করাটা অনেক বেশি শান্তির।

ধার্মিক রীতি-নীতি আমাদের একটা সহজ-সরল রাস্তা দেখায়, যার সাহায্যে আমরা ফ্লো'র মধ্যে প্রবেশ করতে পারি।হঠাৎই সামনে কোনও বড়ো লক্ষ্য উপস্থিত হলে তা প্রাপ্ত করা আমাদের কাছে কঠিন ও অসম্ভব হয়ে ওঠে।কিন্তু রীতি-নীতি খেয়াল করে চললে আমরা প্রতিটা পদে প্রশিক্ষণ লাভ করি, ওই রাস্তায় কীভাবে চলবো তার একটা দিশা আমরা পেয়ে যাই।তাই যখনই আপনার সামনে কোনও বড়ো লক্ষ্য উপস্থিত হবে তখনই সেটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিন ও একটা একটা করে ধাপ এগোতে থাকুন।

কীভাবে প্রতিদিনের কাজের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে নেওয়া যায় তার সন্ধান করুন। তাতে করে আপনি ফ্লো-তে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন।পরিণামের কথা ভুলে যান, আপনার থেকেই পজেটিভ পরিণাম আপনি প্রাপ্ত করতে পারবেন। কীর্তির মধ্যেই আনন্দ, আমরা কী পেলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কাজ করার সময় আমরা কতটা আনন্দ উপভোগ করছি, সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, ধর্ম কিন্তু নিয়মের থেকে অনেক বড়ো।যারা জীবনে অনেক কিছু পেয়ে যায় তারা কিন্তু আনন্দ পায় না, বরং যারা জীবনের বেশিরভাগ সময়টা ফ্লো'র মধ্যে অতিবাহিত করতে পারে তারাই জীবনে আনন্দ বেশি পায়।

ইকিগাই খোঁজার জন্য ফ্লো'র ব্যবহার

এই অধ্যায় পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, কোন কাজ বা কাজ গুলি করার সময় আপনি ফ্লো-তে চলে যান।সেই কাজ গুলি একটা কাগজে লিখে নিন। এবার এই কাজ গুলি কোন সূত্রে বাঁধা তা বোঝার চেষ্টা করুন, অর্থাৎ কী কারণে এই কাজ গুলি করার সময় আপনি ফ্লো'র কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছেন?এই কাজ গুলি কী আপনি একাই করেন নাকি কোনও দলের অংশ হিসাবে?শারীরিক পরিশ্রম করতে আপনার বেশি ভালো লাগে নাকি মগজের কাজ করতে?

হয়তো এই প্রশ্ন গুলির উত্তর থেকেই আপনি নিজের ইকিগাই-এর সন্ধান পেতে পারেন।যদি তা না হয় তাহলে অনুসন্ধান চালিয়ে যান, কোন কাজ করার সময় আপনি শীঘ্রই ফ্লো-তে যেতে পারেন, তার সন্ধান করার চেষ্টা করুন।যে কাজ করতে আপনার ভেতরে আগ্রহ জন্মায়, সেই কাজ করুন। আপনি ফটোগ্রাফি করার সময় ফ্লো অনুভব করছেন নাকি হাতে রঙ-তুলি নিয়ে রঙের জাদু দেখতে ফ্লো অনুভব করছেন তার খোঁজ করুন। ফ্লো হল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।আপনি যত শীঘ্র এর অনুভব করবেন, তত শীঘ্র তার কাছে পৌঁছাতে পারবেন।যত শীঘ্র এই অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, ততই দ্রুত আপনি নিজের ইকিগাই খুঁজে পাবেন।

৫

দীর্ঘায়ু মাস্টার্স

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মার্গদর্শন

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মার্গদর্শন

কীভাবে আনন্দদায়ক, দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত করা যায় সেটাই এই পুস্তক লেখার মূল উদ্দেশ্য নয়, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই বই লেখা শুরু হয়নি।আনন্দে ভরা দীর্ঘ জীবন কীভাবে লাভ করা যায় সেটা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

যারা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, তারা এই সম্পর্কে কী বলেন সেটা জানাও খুবই জরুরি।ওকিনাওয়াতে যাঁদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, তা ছিল অসাধারণ।সেই সাথে সারা পৃথিবী জুড়ে দীর্ঘায়ু নিয়ে যে তত্ত্বজ্ঞান আছে, সেই গুলি জানাটাও খুবই জরুরি।এই পুস্তকে এমন মানুষদের সম্পর্কে কথা বলা হবে যারা ১১০ (সুপারসেন্টেনারিইন্স) বছরের বেশি সময় বেঁচে ছিলেন।

'সুপারসেন্টেনারিইন্স' শব্দের প্রয়োগ সবার আগে ১৯৭০ সালে গিনিজ বুক অফ রেকর্ডস-এর সম্পাদক নরিস ম্যাকওয়ার্টার করেছিলেন।তবে শব্দটির প্রচার হয়েছিল ১৯৯০ -তে। উইলিয়াম স্ট্রাউস এবং নীল হাউ এই 'সুপারসেন্টেনারিইন্স' শব্দের বহুল ব্যবহার করেন।আজকের তারিখে সারা বিশ্ব জুড়ে খোঁজ করলে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ জন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে যাদের বয়স ১১০ বছরের বেশি।যদিও তাদের মধ্যে ৭৫ জনের বয়সের প্রমাণ পত্র পাওয়া গিয়েছে। এরা সুপারহিরো না ঠিকই কিন্তু তারা অন্যদের তুলনায় এই পৃথিবীর মাটিতে অনেক বছর বেশি কাটিয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ সারা বিশ্বের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, গড় আয়ু দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে করে 'সুপারসেন্টেনারিইন্স'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই পারে।আসুন এবার দেখা যাক এই দীর্ঘায়ুর মানুষেরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে কী বলতে চান।
মিসাও ওকাওয়া (১১৭)

''খাবার খান, ঘুমান ও দীর্ঘায়ু লাভ করুন। আপনাকে আরাম করার কলা রপ্ত করতে হবে।''

জেরেন্টোলজি রিসার্চ গ্রুপের গবেষণা অনুসারে ২০১৫-র এপ্রিল মাস পর্যন্ত মিসাও ওকাওয়া ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা।এরপর তিনি হাসপাতালে মারা যান, তখন তাঁর বয়স ছিল ১১৭ বছর ২৭ দিন।

১৯১৯ সালে এক টেক্সটাইল ব্যবসায়ীর ঘরে মিসাও ওকাওয়া জন্ম নিয়েছিলেন। কয়েক যুগ ধরে এই পৃথিবীর বুকে কাটানো এই মহিলা নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেছেন। ১১০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একা থাকতেন, এবং কাউর সাহায্য ছাড়াই নিজের সমস্ত কাজ করতে পারতেন।

লোকেরা যখন তাঁর কাছ থেকে এই দীর্ঘ জীবনের রহস্যের কথা জানতে চাইতো তখন তিনি বলতেন, সুশি পদ্ধতিতে খাবার বানানো ও ঘুমানো।তাঁর এই জবাবের সাথে আমরা আর একটা বিষয় যুক্ত করতে পারি, তাহল তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি।তিনি কীভাবে এতবড়ো একটা জীবন লাভ করলেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি হেসে ফেলেন ও বলেন, "আমি নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি।"

জাপান বয়স্কদের ভূমি, ইতিমধ্যে এই কথনের সত্যতা প্রমাণিত।১১২ বছর ১৫০ দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সাকারী মামোই, সেই সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ। কিন্তু সেই সময়তেও তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো ৫৭ জন মহিলা বেঁচেছিলেন।

মারিয়া কপোইউলা (১১৬)

''কোনও দিন মাছ-মাংস খাইনি।''

সাল ১৮৮৯ একুয়াএডোর-এ জন্ম নিয়েছিলেন মারিয়া কপোইউলা, বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম, সেই অনুসারে গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছিলেন তিনি। ২০০৬ সালে নিমোনিয়ায় ভুগে তিনি মারা যান।তাঁর তিন সন্তান, ১২ জন নাতি ও নাতির ঘরে ২০ টি বাচ্চা ছিল। ১০৭ সালে তিনি শেষ সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নিজের স্মৃতি ও বিচার-বিবেচনা নিয়ে বলেন, "আমি খুবই খুশি, আর এত বড়ো একটা জীবন দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।আমি কোনও দিন ভাবিনি, আমি এত বছর বাঁচবো।আমার স্বামী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন, তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৪ বছর।তখন আমার দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে সংসার, এখন তাদের সংসার বড়ো হয়েছে, নাতি ও তাদের সন্তানরাও এই পৃথিবীর মুখ দেখেছে।

একটা কথা মানতেই হবে, আগেকার দিনে জিনিস-পত্র খুব ভালো পাওয়া যেত। মানুষরা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকতো।একসাথে ওঠা-বসা, নাচা-গাওয়া প্রভৃতি সবই চলতো। তবে তার মধ্যেও একটা অনুশাসন ছিল, আমার মারিয়া লুইস অলারকনের গান খুব ভালো লাগতো, আজও আমার প্রতিটা গানের

কথা মনে আছে। আজও বহু প্রার্থনা শব্দ মনে আছে, আমি প্রায়ই সেগুলি উচ্চারণ করি। সুযোগ পেলে আমি আজও নাচি, গান গাই। স্কুল জীবনে নিজের হাতে যে জিনিস গুলি বানাতে পারতাম, সেই কাজগুলি আমি আজও করতে পারি।"

অতীতের এই কথা গুলি বলতে বলতে তিনি হঠাৎ-ই নাচতে শুরু করেন।তাঁর ভেতরের উর্জা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের যৌবন ফিরে পেয়েছেন।

তাঁর এমন দীর্ঘ জীবন লাভের পিছনে কোন রহস্য কাজ করছে? এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "রহস্য কী তা বলতে পারবো না, কিন্তু নিশ্চয়তার সাথে একটা কথা বলতে পারি, আমি আমার জীবনে কোনও দিন মাছ-মাংস মুখে দিইনি। আমার মনে হয় এটাই আমার দীর্ঘ জীবনের রহস্য।"

জিন কাল্মেন্ট (১২২)

''সব ভালোই চলছে।''

সাল ১৮৭৫-এ ফ্রান্সে জন্মেছিলেন জিন কাল্মেন্ট। ১৯৯৭ সালের ৪ আগস্ট বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা হিসাবে তিনি নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১২২ বছর। তিনি একবার উপহাস করে বলেছিলেন আমি মেথুসেলাহাঁ-র (৯৬৯ বছর বেঁচে থাকা কুলপিতা হিসাবে পরিচিত) সাথে প্রতিয়োগিতা করছি।তিনি নিজের জীবিত দশায় বহু রেকর্ড ব্রেক করেছিলেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন ও আনন্দে দিন অতিবাহিত করেছেন। ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সাইকেল চালাতেন। ১১০ বছর পর্যন্ত তিনি একাই থাকতেন। একবার তাঁর বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল, তাই ওনার সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তাঁকে কেয়ার সেন্টার পাঠানো হয়।চোখে ছানি হওয়ার কারণে তিনি ঠিক মতো দেখতে পেতেন না, এমনকী সেই সময় ঠোঁটে

সিগারেট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে ১২০ বছর বয়সে এসে তাঁকে সিগারেট ছাড়তে হয়।

তিনি সারাক্ষণ আনন্দে থাকতেন ও জোশের সাথে সব কাজ করতেন, হয়তো এটাই তাঁর বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড়ো রহস্য।১২০ বছর বয়সে তিনি বলেছিলেন, "আমি চোখে ঠিক মতো দেখতে পাইনা, শুনতেও অসুবিধা হয়, শরীরটাও ঠিক নেই, বাকি সব ঠিক আছে।"

ওয়াল্টার ব্রেনিং (১১৪)

"আপনি যদি নিজের মন ও শরীরকে সক্রিয় রাখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই দীর্ঘায়ু লাভ করতে সক্ষম হবেন।"

১৮৯৩ মিনেসোতা-তে জন্মেছিলেন ওয়াল্টার ব্রেনিং, তিনি নিজের জীবনে বেশ কয়েকটা যুগ দেখতে পেয়েছিলেন।মোংটানা-তে ২০১১ সালে বয়সের ভারে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন তিনি। জীবনের ৫৫ বছর তিনি রেলওয়ের সেবায় কাটান, তাঁর দুই স্ত্রী ছিল।৮৩ বছর বয়সে তিনি মোংটানা-তে অবসর নেন ঠিকই কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু (যারা বয়সের প্রমাণ দিতে পেরেছিলেন সেই অনুসারে) লাভকারী ব্যক্তি।

জীবনের শেষ লগ্নে এসে তিনি বেশ কিছু সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের জন্য তিনি তাঁর বেশ কিছু অভ্যাসকেই শ্রেয় দিয়েছেন।যতক্ষণ শরীর সঙ্গ দিয়েছে ততক্ষণ কাজ করা এবং দিনে মাত্র দুইবার খাবার খাওয়া, এই দুটি বিষয়ের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১১২ বছর বয়সে তিনি

বলেছিলেন, "আপনি যদি নিজের মন ও শরীর সক্রিয় রাখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করতে সক্ষম হবেন।"তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যায়াম করে গিয়েছেন।

তাঁর জীবনের কয়েকটা অভ্যাসের মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার অভ্যাসও অন্যতম।তিনি কোনও দিন মৃত্যুকে ভয় পাননি। ২০১০ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের প্রত্যেককেই কোন না কোন দিন মরতেই হবে।কিছু মানুষ মৃত্যুর কথা শুনলে ঘাবড়ে যায়, কিন্তু ভয় পাবেন না, কারণ আপনি যখন জন্মেছেন তখন আপনাকে মরতেই হবে।"

২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি পাদ্রিকে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে জানিয়েছি, আমার সাথে যা যা ঘটেছে তার থেকে আর ভালো কিছু ঘটতেই পারেনা।তাই এবার আমার যাওয়ার সময় এসে গিয়েছে।"

আলেকজান্ডার ইমিচ (১১১)

''আমি এখনও পর্যন্ত মরিনি''।

১৯০৩ সালে পোল্যান্ডে জন্ম নিয়েছিলেন আলেকজান্ডার ইমিচ।তিনি একজন কেমিস্ট ও প্যারাসাইকোলজিস্ট ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি যখন মারা যান তখন তিনি ইউনাইটেড স্টেটসে থাকতেন। সেই সময় সারা বিশ্বের মধ্যে তাঁর বয়স ছিল সবচেয়ে বেশি।ইমিচের জীবন যাপন ছিল খুবই সরল, তিনি কখনই বিলাসিতা করেননি, সেই সাথে কোনও দিন মদ্যপান করেননি তিনি, তাঁর দীর্ঘ জীবনের জন্য এই দুটি অভ্যাসকেই শ্রেয় দিয়েছেন।যখন তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তির সম্মান দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেন, "এটা নোবেল পুরস্কার জয়ের

মতো কোনও মহান কাজ নয়।আমি কোনও দিন ভাবিইনি আমি এত বছর বাঁচবো।কীভাবে এই দীর্ঘ জীবন পেলাম, আমি নিজেও জানিনা, তবে একটা কথা সত্য যে, আমি এখনও মরিনি।"

ইকিগাই শিল্পী:

শুধুমাত্র সুপারসেন্টেনারিইন্স-রাই যে দীর্ঘ জীবনের রহস্য জানেন, তা একদমই ঠিক নয়।এমন বহু লোক আছেন যাদের নাম গিনিজ বুকে নেই, কিন্তু তাঁরাও দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং জীবনের নতুন পাঠ পড়িয়ে গিয়েছেন আমাদের।এই শিল্পীরা অবসর গ্রহণের পরেও নিজেদের ইকিগাই অনুসারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন।

কলা, তা যেমনই হোক না কেন, তা আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং আমাদের এনে দেয় বেশ কিছু খুশির মুহূর্ত। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, এই মুহূর্ত সকলেই উপলব্ধি করেন।

হোকুসাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ৯৯ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি ইউকিও-ই স্টাইল পদ্ধতিতে কাঠের বস্তুর উপর ছাপের কাজ করতেন। এই শিল্পী 'ওয়ান হান্ড্রেড ভিউজ অফ মাউন্ট ফুজি' নামক পুস্তকে লিখেছেন,

"আমি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত যে জিনিস গুলি বানিয়েছিলাম সেই গুলির গণনা করা উচিত না। ৭৩ বছর বয়সের পর আমি পশু, পাখি, গাছ-পালা এবং কীট-পতঙ্গের সংরচনা বুঝতে সক্ষম হই। জীবনের ৮০ বছর বয়সের পর আমি সামান্য উন্নতি করেছিলাম বলে আমার মনে হয়।আমি বিশ্বাস করি, ৯০ বছর বয়সের

মধ্যে আমি অবশ্যই নিজের কাজের রহস্য বুঝে যাব।১০০ বছরের মধ্যে আমি অবশ্যই এই কাজে নিপুণ হয়ে যাব, আশা করি ১১০ বছর বয়সের মধ্যে নিজের এই কাজের সাহায্যে জীবনের আবেগ ও আসল অর্থ ব্যক্ত করতে সক্ষম হবো।"

পরবর্তী কয়েকটা পৃষ্ঠায় আমি আপনাদের নিউইয়র্ক টাইমসের জন্য কমিলে সুইনে যে মহামূল্যবান শব্দগুলি একত্রিত করেছিলেন সেই গুলিই বলবো, এখানে তিনি বিখ্যাত কিছু শিল্পীর বিশেষ কিছু শব্দ একত্রিত করেন। এই শিল্পীদের মধ্যে একজনও কোনও দিন অবসর নেননি। তাঁরা আজও আনন্দের সাথে নিজেদের কাজ করে চলেছেন, আমাদের লক্ষ্য যদি স্পষ্ট হয়, তাহলে কেউই কোনও দিন আমাদের আটকাতে পারবে না।এই কথাটি তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, আর সেটাই সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেন।

অভিনেতা ক্রিস্টোফার প্লমর ৮৬ বছর বয়সের পরেও নিজের কাজকে সমান ভাবেই ভালোবাসতেন, সেই কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,"আমি যেন স্টেজে অভিনয় করার সময়তেই মারা যাই, এই পৃথিবী ত্যাগের এটাই হল সবচেয়ে ভালো পথ।

ওসামু তেঝুকাজিন-কে আধুনিক জাপানি পদ্ধতির জনক বলা হয়। ১৯৮৯ সালে তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তিনি মনের ভাব প্রকাশের জন্য একটা কার্টুন বানান,যাতে লেখা ছিল, "প্লিজ জাস্ট লেট মি ওয়ার্ক' অর্থাৎ দয়া করে আমাকে কাজ করতে দিন।চলচিত্র পরিচালক ফেড্রিক ওয়াইজমন ৮৬ বছর বয়সের পর বলেন, তিনি আজও যে নিপুণতার সাথে কাজ করতে সক্ষম তার জন্য একটাই কারণ আছে, আর তাহল কাজের প্রতি তাঁর প্রেম।তাঁর মতে, "আমার বয়সের বেশির ভাগ লোক অসুস্থতার বাহানা দেন, তাঁদের মুখে সর্বদাই এই অভিযোগ শোনা যায় যে, শরীর সঙ্গ দিচ্ছেনা।কিন্তু আমার বন্ধু ও তাঁদের পরিবার কাজকে ভালোবাসে, ও তাঁরা সারাটা জীবন কাজের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত করতে চায়।"

কার্মেন হেরেরা, তিনিও ১০০ বছর বেঁচে ছিলেন।৮৯ বছর বয়সে জীবনের প্রথম ক্যানভাস বিক্রি করেন।মর্ডান এণ্ড দ্যা মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্ট-এ তাঁর কাজ গুলি সংরক্ষিত করে রাখা হয়। এই সময় যখন তাঁকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, "আমি সর্বদা পরবর্তী কাজের কথা ভাবি।কিছু লোকের এই কথা শুনে মূর্খামি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি প্রতিদিন নিজের কাজকে আরও অভিনব করে তোলার চেষ্টা করি।"

সর্বদা শিখতে থাকুন:

হয়তো আপনার বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে, শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে,আপনি ভেতর থেকে ক্লান্তি অনুভব করছেন,হয়তো শরীরের ব্যথায় ঠিকমতো ঘুমাতে পর্যন্ত পারেন না, হয়তো আপনার স্ত্রীও আপনার সঙ্গ ত্যাগ করে বহু দূরে চলে গিয়েছেন, আপনার সমস্ত স্বপ্ন হয়তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, আত্মবিশ্বাস আপনার সঙ্গ ত্যাগ করেছে তবু একটা কথা মাথায় রাখবেন শেখার শেষ নেই, তাই শিখতে থাকুন, কারণ একমাত্র এটাই পারে যেকোনও পরিস্থিতি বদলে দিতে।এর সাহায্যে আপনি লাভবান হতে পারেন, শেখার সময় আপনার মন কখনই ক্লান্তি অনুভব করেনা, তার জন্য আপনার কোনও দিন অনুতাপ হবেনা।

-টি. এইচ. হোয়াইট, দ্যা ওয়ান্স এণ্ড ফিউচার কিং

প্রকৃতি প্রেমী ও লেখক এডওয়ার্ড ও. উইলসন একবার বলেছিলেন, "আমার সবসময় মনে হত, আমার অনেক জ্ঞান আছে, আমি যেকোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। কিন্তু গত দশ বছর ধরে আমার মাথা বেশ কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, "আমি কে?কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব?" আমি এই বিষয়ে পড়তেও শুরু করেছি, আর তারপর বুঝতে পারি আমার জ্ঞান কতটা সীমিত।"

এলসওয়ার্থ কেলি ২০১৫ সালে ৯০ বছর বয়সে মারা যান, তিনি বলেছিলেন, "বয়সের সাথে সাথে আমাদের ইন্দ্রিয় গুলি দুর্বল হয়ে যায়, এটা এক বিরাট ভুল ধারণা।আমার তো মনে হয় আমাদের বয়স যত বৃদ্ধি পায় আমরা যেন আরও বেশি করে শুনতে পাই, আরও বেশি করে দেখতে পাই।আপনার বয়স যত বৃদ্ধি পাবে, দেখার কলা তত বেশি করে রপ্ত করতে পারবেন। আমি প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু দেখতে পাই, তাইতো নতুন নতুন ছবি আঁকতে পারি।"

৮৬ বছরের আর্কিটেক্ট ফ্রাঙ্ক গেহরি আমাদের বলেছিলেন, "কিছু ইমারত গড়ে তুলতে সাত বছর পর্যন্ত লেগে যায়।এই রকম ক্ষেত্রে সংযম ও বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকার কলা বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। গুগেনহাইম বিল্লা মিউজিয়াম-এর নির্মাতা বর্তমানকে আশ্রয় করে কীভাবে বেঁচে থাকা যায় সেই কলা বিশেষভাবে রপ্ত করেছিলেন। তিনি বলতেন, "আপনি শুধুমাত্র বর্তমানেই বাঁচতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলেও অতীতে যেতে পারবেননা।বর্তমানে বেঁচে থাকার জন্য নিজের চোখ ও কান খুলে রাখুন, খবরের কাগজ পড়ুন, আপনার আশেপাশে কী ঘটছে সেদিকে নজর রাখুন।যেকোনও কাজের ব্যাপারে মনে জিজ্ঞাসা রাখুন, এইভাবেই আপনি নিজেকে বর্তমানে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন।"

জাপানের দীর্ঘায়ু জীবন:

জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখার জন্য আমাদের কাছে যন্ত্র আছে।হয়তো সেই কারণেই আমেরিকার মানুষদের দীর্ঘায়ু লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়।কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘায়ু লোকের সংখ্যা জাপানে সবচেয়ে বেশি। গ্রামের পরিবেশ শান্ত ও আনন্দদায়ক, সেই কারণে গ্রামের লোকেরা অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচেন।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানিরাই সবচেয়ে বেশি আয়ু লাভ করেন তা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। সঠিক খাদ্য-সংস্কৃতি, অসুস্থ হওয়ার আগে ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকা, তাঁদের দীর্ঘায়ুর জন্য এই বিষয় গুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় জীবন, মিলেমিশে থাকা, জীবনের শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকা, এই বিষয় গুলিও তাঁদের দীর্ঘায়ু লাভের অন্যতম কারণ।

প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক, সর্বদা সক্রিয় থাকার জন্য নিজের জীবনের ইকিগাই সম্পর্কে জানাটা খুবই জরুরি। আপনার ইকিগাই আপনাকে আকর্ষক করে তুলবে, এবং কীভাবে আপনি অন্যদের কাজে লাগতে পারেন সেই বিষয়ে প্রেরণা দেবে।

৬

জাপানে বসবাসকারী বয়স্ক মানুষদের থেকে কী শিখবেন?

আনন্দিত ও দীর্ঘ জীবন পাওয়ার জন্য জাপানের রীতিনীতি ও প্রবাদ-প্রবচন

ওগিমি পৌঁছাতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল।প্রথমে আকাশ পথে টোকিও থেকে নাহা যেতে হয়, সেটা ওকিনাওয়ার রাজধানী।কয়েকমাস আগে ফোনে সেখানকার প্রধানের সাথে আমাদের কথা হয়েছিল, আমরা কী কারণে সেখানে যাচ্ছিলাম তাও তাঁকে জানিয়ে রেখেছিলাম।সেই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকট করি, সেই নিয়েও বহু বিচার বিবেচনার পর আমাদের তাঁর সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়।তখন আমরা সেই গ্রামের কাছাকাছি একটা ঘর ভাড়া করি। এই বই শুরু করার প্রায় এক বছর বাদে আমাদের মনে হয়, সবচেয়ে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা। আমাদের মনে হয়, সেখানেই যেন সময় আটকে গিয়েছিল, কারণ সেখানকার লোকেরা 'আজ, এখন, এখানে' নিয়ে বাঁচতে জানতো।

ওগিমি-তে পৌঁছানো

নাহার থেকে দুই ঘণ্টা ভিড় রাস্তা ঠেলে আসার পর আমরা অপেক্ষাকৃত কম জনবসতি পূর্ণ এলাকায় এসে পৌঁছাই। আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তার একদিকে ছিল সমুদ্র আর অপরদিকে ছিল ইয়ানবারু জঙ্গলে ভরা পাহাড়। প্রায় ৫৯ কিমি. পথ অতিক্রম করার পর আমরা নাগো পৌঁছাই। এখানে ওকিনাওয়া ওরিয়ন বিয়ার বানানো হয়। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঘর ও দোকান দেখতে পাওয়া যায়।

ছোট-ছোট দোকান কাটিয়ে আমরা ওগিমি নগরপালিকা-তে পৌঁছাই। সেখানরকার বাড়ি-ঘর গুলির মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নজরে পড়েনি। জিপিএস-এর সাহায্যে যেখানে যাওয়ার ছিল, আমরা সেখানেই পৌঁছে যাই। রাস্তার ধারের ঘর-বাড়ি গুলি দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, তা অনেক পুরানো।

তায়রা নামের সেখানকার এক মহিলা আমাদের পথ চেয়ে বসেছিলেন।দরজা খুলে ভিতরে যেতেই তায়রার সাথে দেখা হয়, তাঁর পাশে আর একজন বেঁটে করে

মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একগাল হাসি নিয়ে আমাদের স্বাগত জানান, তাঁর নাম ছিল ইউকি।তিনি আমাদের স্বাগত জানিয়ে কনফারেন্স রুমের দরজা দেখিয়ে দেন। তিনি আমাদের গ্রিন-টি ও শিকুবাসা নামক এক পুষ্টিকর ফল দেন।

তায়রা আমাদের সামনে বসে আমাদের সম্পূর্ণ প্ল্যানর দেখাচ্ছিলেন আর ইউকি তাঁর পাশেই বসেছিলেন। তাঁর কাছে যে বই ছিল তাতে সেই অঞ্চলের বয়স্ক বাসিন্দাদের নাম নথিভুক্ত করা ছিল, তাঁরা কোন ক্লাবের বা 'মোআই'-র সদস্য সেই অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল।তায়রা আমাদের জানিয়েছিল যে, সেখানকার বাসিন্দারা মিলে মিশে থাকে এবং একে অপরকে সাহায্য করে। এটাই ছিল ওগিমি-র বিশেষত্ব।'মোআই'-র অর্থ হল একই উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করা দল। তাঁরা একই পরিবারের সদস্যের মতো জীবন যাপন করে। তায়রা আমাদের জানিয়েছিল, এটা অনেকটা স্বয়ংসেবক সংঘের মতো, তাদের কাছে পয়সার তুলনায় অন্য জিনিস গুলির গুরুত্ব অনেক বেশি, আর এইভাবেই লোকেরা প্রেরণার সাহায্যে কাজ চালিয়ে যান।এখানে সকলেই সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ পান ও সরকার সকলের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেয়। এতে করে সকলেই বোঝেন তারাও সমাজের একটা অঙ্গ এবং সমাজে তাদের কিছু গুরুত্ব আছে।

আর্চিপেলামোর উত্তর দিকের সবচেয়ে বড়ো টাপু কেপ হেডোর আগে ওগিমি আসে।ওগিমি পাহাড় থেকে একসাথে পুরো ওগিমি শহরটা দেখা যায়। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলে খুব কম ঘরই চোখে পড়ে, কারণ বেশিরভাগ অংশটাই সবুজে ঘেরা। ওখানে প্রায় ৩২০০ লোকের বাস।

সামাজিক জীবন:

আমাদের ওগিমি-র একটা ছোট্ট হোটেল থেকে খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।সেই হোটেলে পৌঁছে আমরা জানতে পারি সেখানে মাত্র তিনটি টেবিল সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।নিজের গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ইউকি

বলেন, "কোনও অসুবিধা নেই, আমরা চুরামিতে যাই, ওখানে নিশ্চয়ই খালি হবে।"

৮৮ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব ভালো গাড়ি চালাতেন, সেই নিয়ে তাঁর ভেতরে অহংকারও ছিল।তাঁর সাথে যে সহায়ক ছিলেন তাঁর বয়স ছিল ৯৯, তিনি সারাদিন আমাদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।তাঁদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের অনেক সময়তেই গাড়ি দ্রুত চালাতে হয়, কিন্তু সেই রাস্তায় সেটা করা ততটা সহজ ছিল না।যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আমরা জঙ্গলের অপর প্রান্তে পৌঁছাই ও সেখানে খাবার খেতে বসি।

ইউকি একটা চেয়ার টেনে বসেন আর বলেন, "আমি বেশি হোটেলে খাইনা। আমার একটা ছোট্ট বাগান আছে, সেখানে যে শাক-সবজি হয় আমি সেগুলিই খাই।আমার অনেক দিনের বন্ধু তানাকার কাছ থেকেই সব সময় মাছ কিনি।"হোটেলটা সমুদ্রের খুব কাছেই ছিল, স্টার ওয়ার্স ফিল্মে যেমন টাকু দেখানো হয়েছিল, এখানকার দৃশ্যও ছিল সেই রূপ। সেখানকার মেনুকার্ডে লেখা ছিল, আমরা গ্রামের বাগানে যে সবজি ও মরশুমি ফল উৎপাদিত হয় তা দিয়েই স্লো ফুড তৈরি করি।

"আমার মনে হয় খাদ্য আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"ইউকি হঠাৎই নিজের মনের কথা বলেন, আসলে তিনি কথা বলতে ভালোবাসতেন।বিভিন্ন সংস্থার মুখ্য পদে কাজ করার দায়িত্ব ছিল ওনার ওপর তাই কথা বলার অভিজ্ঞতা ও অধিকার দুইই ছিল তাঁর কাছে।

"খাওয়ার সাথে দীর্ঘায়ুর তেমন কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয়না।"খাওয়ার পর একটা মিষ্টির ছোট্ট টুকরো নিজের মুখে দিয়ে ইউকি বলেন,"আসলে তো আপনি আজকের দিনটা কীভাবে কাটাচ্ছেন, জীবন কতটা উপভোগ করছেন তার উপরেই আপনার বেঁচে থাকাটা অনেকখানি নির্ভর করে।

ওগিমি-তে কোনও পানশালা ছিলনা, সেখানে হোটেলের সংখ্যাও খুব কম। আমাদের এখানে খুশির সংজ্ঞাটা একটু আলদা। আমাদের এখানে সামাজিক কেন্দ্রে লোকেরা একে অপরের সাথে দেখা করেন।শহরের চারপাশে ছোট-ছোট গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামের একজন করে প্রধানও আছে।কলা, উৎসব, সামাজিক কার্য এবং দীর্ঘায়ু প্রভৃতি বিভাগের জন্য এক একজন করে প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়। এখানকার মানুষরা দীর্ঘায়ুর বিভাগের দিকে বিশেষ ধ্যান দেন।"

একটা ছোট্ট গ্রামের সামাজিক কেন্দ্র থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমাদের। আমাদের যানবারু জঙ্গলের ভেতরের এক পুরানো ভবনে যেতে বলা হয়। ওই জঙ্গলটা বুনাগয়ার জন্য এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যানবারু জঙ্গলের বুনাগয়া:

বুনাগয়া হল এক ধরনের জীব।তা যানবারু ও ওগিমি জঙ্গলের আশেপাশের শহরেই থাকতো। সেই গুলিকে দেখতে অনেকটা ছোট বাচ্চাদের মত, তাদের চুল লম্বা ও লাল হয়। তারা জঙ্গলের গজুমারু (অর্থাৎ বটগাছ)-তে থাকতে ভালোবাসে। তারা সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছ ধরতেও ভালোবাসে। s

ওকিনাওয়া সম্পর্কে বলতে গেলে বুনাগয়া চৈতন্য সম্পর্কে বলতেই হবে, কারণ এর অনেক বিষয়ই এর সাথে যুক্ত।এরা খুবই আনন্দে থাকে এবং আশাতীত কাজ করে। সেখানকার লোকেরা বলেন বুনাগয়া পাহাড়, নদী, সমুদ্র, গাছ, পৃথিবী, হাওয়া এবং পশু-পাখি পছন্দ করে।আপনি যদি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চান তাহলে সবার আগে আপনাকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখতে হবে, তার সাথে একাত্ম হতে হবে, তা ব্যক্তও করতে হবে।

জন্মদিনের পার্টি:

আমরা সেই সামাজিক কেন্দ্রে পৌঁছে যাই। সেখানে প্রায় কুড়ি জন সদস্য ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই উষ্ণতার সাথে আমাদের স্বাগত জানান।তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারি, সেই দলের সবচেয়ে ছোট সদস্যের বয়স ছিল ৮৩ বছর। টেবিলের ওপর গ্রিন-টির কাপ সাজানো ছিল, সেখানে বসেই আমরা তাঁদের সাথে কথা বলি। তারপর আমরা পাশের খোলা মাঠে যাই, সেখানে তিনজন ব্যক্তির জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে একজন মহিলার বয়স ছিল ৯৯ বছর, অপর জনের ৯৪ আর বার্থডে বয়ের বয়স ছিল ৮৯ বছর।

সেখানকার গ্রামে গাওয়া হয় এমন কিছু গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, ইংরেজি গান 'হ্যাপি বার্থডে' দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। ৯৯ বছরের মহিলা ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভান এবং পার্টিতে উপস্থিত প্রতিটা মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানান। বাড়িতে তৈরি শিকুবাসার কেক কাটা হয়, কুড়ি-বাইশ বছরের কোন মানুষের জন্মদিনের পার্টিতে যেমন নাচ-গান হয় এখনও ঠিক তেমনটাই হয়েছিল।এটা আমাদের প্রথম পার্টি ছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর থেকে পার্টির যেন আর শেষ হয়নি। সেখানকার লোকেরা খুবই ভালো গান গাইত, আমরাও তাদের সাথে গান গাই, খাবার খাই, এইভাবে ধীরে ধীরে আমরাও যেন তাদেরই একজন হয়ে উঠছিলাম। সেখানে যতদিন ছিলাম প্রতিদিন কোন না কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করি।

খুশির মধ্যে দিয়ে জীবন কাটানো ওগিমি-র সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ:

ওগিমির জীবন শৈলীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেখানকার বয়স্ক লোকেরা 'গেটবল' বলে একটা খেলা খেলেন, আমাদেরও তা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।তাতে কাঠের তৈরি হাতল দিয়ে বল মারা হয়, খুবই

কম পরিসরে কম লোক নিয়ে এই খেলা খেলা হয়, তাই চারজন লোক এক হলেই নিজেদের মধ্যে এই খেলা শুরু করে দেয় তারা।সেখানকার লোকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, কিন্তু কে কে সেই খেলায় অংশ নিতে পারে তার জন্য বয়সের কোনও মাপ কাঠি নির্ধারণ করা হয়না।

আমরাও সেই খেলায় অংশ নিই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১০৪ বছরের এক মহিলার কাছে আমরা পরাজিত হই। সেখানকার প্রতিটা মানুষ তাঁকে খেলার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিলেন, আর দেখতে দেখতে তিনি আমাদের মুখের হাসি গায়েব করে দেন। যারা গ্রামে বাস করেন, তাঁদের খুশির জন্য খেলা-ধুলা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সামাজিক মেলবন্ধনের সাথে আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ওকিনাওয়ার ভগবান:

ওকিনাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল রিযুকু্য শিন্তো।রিযুকু্য ওকিনাওয়ার টাপুগুলির সমূহের নাম আর শিন্তোর মানে হল ভগবানের দিকে যাওয়ার রাস্তা।রিযুকু্য শিন্তো-র মধ্যে চীনের বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসিয়ানিজম ও তাওইজমের সামান্য ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়।শিন্তোইজম মনে করে, কিছু লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের চৈতন্য প্রাপ্ত করার ক্ষমতা থাকে। সেই সাথে গাছ-পালা, পশু, পাথর, এবং প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেও ঈশ্বরের চৈতন্য থাকে, মানুষের উপর তার একটা প্রভাব পড়ে।

প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এই ধর্মের অনুসারে এমনটা মনে করা হয় বেশ কিছু আত্মা মিলেমিশে এই বিশ্বের নির্মাণ করেছে। এই চৈতন্য ঘরে, জঙ্গলে, গাছে এবং পাহাড়ের মধ্যেও থাকে। শান্ত মনে, ধার্মিক বিধির সাহায্যে আমরা পবিত্র পরিবেশে ওই চৈতন্যের আমন্ত্রণ করতে পারি।ওকিনাওয়াতে এমন বহু পবিত্র স্থান আছে যা জঙ্গলে ঘেরা। তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরও আছে। একটা হল ওটাকি আর অপরটি ওগঞ্জু।আমরা ওগঞ্জু মন্দিরে গিয়েছিলাম।এটা

ছোট্ট একটা মন্দির, যার পাশ দিয়ে একটা ঝর্ণা গিয়েছে।চারদিকের উন্মুক্ত বাতাবরণে হাওয়া ও আলো খেলা করে, এটাই ওখানকার বিশেষত্ব। ওটাকি মন্দিরটা পাথর দিয়ে তৈরি, ওখানকার মানুষেরা সেখানে পুজো করতে আসেন। ওখানকার মানুষদের বিশ্বাস ওই মন্দিরে আত্মারা বাস করে।

ওকিনাওয়ার ধর্মানুসারে মহিলাদের পুরুষদের থেকে বেশি সক্ষম বলে মনে করা হয়।যুতা এমন মহিলা যাঁদের সাহায্যে আত্মাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। জাপানে প্রতিদিন পূর্বপুরুষদের পুজো করা হয়।পরিবারের সবচেয়ে বড়ো ছেলে বাড়ির ছোট্ট একটা ঘরে বা মন্দিরে বসে এই পূর্বপুরুষদের পুজো করেন।

মাবুই

প্রতিটা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অংশ বা মাবুই থাকে।এটাই চৈতন্যের অংশ বা আমাদের জীবনের প্রকৃত স্রোত। এই চৈতন্য অমর এবং আমাদের অস্তিত্বের প্রকৃত পরিচয়।

কখন কখনও এমনটাও দেখা যায়, কোন মৃত মানুষের আত্মা জীবিত মানুষের আত্মার সাথে আটকে যায়। কেউ হঠাৎ মারা গেলে এমনটা ঘটার সম্ভবনা দেখা যায়।বিশেষ করে কেউ যদি কম বয়সে মারা যায়, তাহলে সহজে তার আত্মা এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করতে চায়না।

তাদের ধারণা, শুধুমাত্র কোন সংযোগ দ্বারাই এক মানুষের আত্মা অপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কোনও ঠাকুমা তার নাতিকে দেওয়া আংটির মাধ্যমেও তার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, ফটোর মাধ্যমেও প্রবেশ করতে পারে।

যত বয়স, তত দৃঢ়তা

ওগিমি-তে আমাদের দিন গুলি ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও কাটলেও একটা আরামদায়ক গণ্ডীর মধ্যে দিয়েই আমরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছিলাম।আমরা সেখানকার মানুষদের মতোই কাজ করছিলাম। এমনিতে সেখানকার লোকেদের আপনি বসে থাকতে দেখবেন না, তারা সর্বদা কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তারা শান্তির সাথে নিজেদের কাজ করে তাই কাউর মধ্যে মানসিক চাপ লক্ষ্য করা যায়না। তারা নিজেদের ইকিগাই অনুসারে কাজ করে, কিন্তু কখনই কোন বিষয়ে তাড়াহুড়ো করেনা, শীঘ্র করতেই হবে এমন ভাব তাদের মধ্যে দেখা যায়না।

তাদের মধ্যে সর্বদা একটা খুশির ভাব দেখা যায়, তারা দুশো বছরের পুরানো একটা সিদ্ধান্তের পালন করে, সেই অনুসারে, "আপনি যদি সর্বদা খুশিতে থাকতে চান তাহলে এমন কোনও লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, যার জন্য আপনার মনে অসম্ভব প্রেম থাকবে এবং আপনি সর্বদা কিছু না কিছু প্রাপ্ত করার চেষ্টা করবেন।"

ওগিমি-তে থাকার শেষ দিনে আমরা সেখানকার একটা বাজারে যাই, আমাদের কিছু জিনিস কেনার ইচ্ছা হচ্ছিল। সেই বাজারে বিভিন্ন সবজি, গ্রিন-টি, শিকুবাসার রস এবং চৈতন্য-তে পূর্ণ জল পাওয়া যাচ্ছিল খাওয়ার জন্য।

সেই বোতল গুলিতে লেখা ছিল দীর্ঘায়ু লাভের জন্য পান করুন। আমরা সেই বোতল কিনি এবং সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এই আশা নিয়েই সেই জল পান করি যে, আমরাও দীর্ঘায়ু লাভ করতে সক্ষম হব, এবং নিজের ইকিগাই খুঁজে পাবো। তারপর আমরা বুনাগয়ার ছবি নিই এবং সেখানে লেখা বিভিন্ন বার্তা গুলি পড়তে থাকি।

৮০ বছর বয়সেও আমি ছোটই আছি

৯০ হওয়ার পর যখন তোমার সাথে দেখা করতে যাব, তখন আমাকে ১০০ বছর কাটানোর পরামর্শ দিও।

বয়স এবং দৃঢ়তা:

আপনার বয়স যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, কখনই নিজের সন্তানদের ওপর নির্ভর করবেন না।

আপনি যদি দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার সন্ধান করেন তাহলে আমাদের গ্রামে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।এখানে আপনি প্রকৃতির আশীর্বাদ লাভ করবেন।

আমরা দুজনে মিলে দীর্ঘায়ুর রহস্যের সমাধান করবো।

২৩ এপ্রিল ১৯৯৩

ওগিমি ফেডারেশন অফ সিনিয়র সিটিজন ক্লাবস

সাক্ষাৎ

আমরা সেখানে থাকা কালীন কিছু লোকেদের সাথে কথা বলেছিলাম।তখন সেখানকার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে তাঁদের দীর্ঘায়ুর রহস্য জানতে চাই, সেই সঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁদের ইকিগাই সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিলাম। আমরা তাঁদের জানিয়ে ছিলাম যে একটা ডিকিউমেন্টরি বানাতে চাই, সেই সাথে একটা বইও লেখা হচ্ছে, যাতে এই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১. চিন্তা করবেন না:

দীর্ঘায়ু পেতে হলে সবার আগে চিন্তা ছাড়তে হবে।মনকে যুবক রাখতে হবে, মনের বয়স বৃদ্ধি করা যাবেনা। মন খুলে হাসি মুখে সামনের লোককে স্বাগত জানান। আপনি যদি খোলা মনে হাসি মুখে সকলের সাথে কথা বলেন তাহলে আপনার সামনের বিভিন্ন বয়সের লোকেরা আপনার সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখাবে।

আপনি যদি নিজের ভেতরের চিন্তা দূর করতে চান তাহলে মানুষের সাথে মিশুন, তাদের সাথে মন খুলে কথা বলুন।আমি প্রতিদিন এই কাজটা করি। আমি কাউর সামনে গেলে তাকে প্রণাম জানিয়ে কথাবার্তা শুরু করি। বিদায় নেওয়ার আগে আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিই, বাড়ি ফিরে এসে নিজের বাগানের যত্ন করি, তারপর দুপুর হলে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাই।

আমরা একসাথে হওয়ার চেষ্টা করি, একসাথে হওয়ার জন্য বাহানা খুঁজি, কিন্তু দেখা হওয়ার পর আর কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করিনা। একসাথে হয়ে মজা করাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য।

২. ভালো অভ্যাস:

সকাল ছ'টায় উঠে নিজের বাগানা চলে যাই, সেখানে বিভিন্ন গাছে ফলে থাকা সবজি ও ফল গুলি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।বাগানে গিয়ে নিজের হাতে লাগানো টমোটো ও কমলালেবু গুলি দেখি।এইভাবে নিজের মনকে শান্তি প্রদান করি।এক ঘণ্টা নিজের বাগানে কাটানোর পর ঘরে ফিরে আসি ও জলখাবার খাই।

আমি নিজের বাগানে নিজের হাতে সবজির চাষ করি, সেখান থেকে যে সবজি গুলি পাই সেগুলিই রান্না করে খাই, এটাই আমার ইকিগাই।

বয়স হলেও কীভাবে নিজের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ রাখবেন সেই কলা আপনার আঙুলেই আছে।আপনি যদি নিজেকে সর্বদা চালু রাখেন, অর্থাৎ যদি সক্রিয় থাকেন, তাহলে আপনি অবশ্যই একশো বছর বাঁচবেন।

আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুই, ঠিক ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠি।তারপর কফি খেয়ে হালকা কিছু ব্যায়াম করি, ব্যায়াম আমাকে বেশ খানিকটা উর্জা দেয়।

আমি সব খাই কিন্তু পরিমাণে অল্প।আমার মনে হয় আমার দীর্ঘায়ুর পিছনে এটা এক বিরাট রহস্য। আমি খাওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করি, এতে বেশ মজা লাগে।

আপনি যদি কাজ করা বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনার শরীর শেষ হয়ে যাবে।

আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে শরীরে রোদ লাগাই, আমাদের সর্বদা নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা উচিত।আমার সকাল শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে।

আমি প্রতিদিনই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি, সকালটা নিজের সবজি বাগানেই কাটাই আমি।আমি সপ্তাহে অন্তত একবার বন্ধুদের সাথে নাচি।

আমি প্রতিদিন ব্যায়াম করি, হাঁটতে যাই।

আমি প্রতিদিন কোনও রকম ভুল ছাড়াই টাইসো পদ্ধতিতে ব্যায়াম করি।

সবজি খাই, সবজি আপনাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করে।

দীর্ঘ জীবনের জন্য তিনটি জিনিস খুবই জরুরি- ব্যায়াম, ভালো খাবার এবং বন্ধু-পরিবার।

৩. দিনের খানিকটা সময় বন্ধুদের সাথে কাটান:

বন্ধুদের সাথে থাকাই আমার ইকিগাই। আমরা প্রতিদিন দেখা ও গল্প-গাছা করি। আমার কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।আগামী কাল আবার তাদের সাথে সেখানেই দেখা হবে, এই কথাটা ভাবলেই আমার খুবই ভালো লাগে।

বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সাথে থাকতে আমি খুবই ভালোবাসি।

আমার পছন্দের লোকেদের সাথে কথা বলার সময় আমি খুবই আনন্দ পাই।আর আমার মনে হয় এটা আমার দীর্ঘায়ুর অন্যতম রহস্য।

আমি যখনই রাস্তা দিয়ে যাই তখন স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের 'হ্যালো' বলি এবং সেই সাথে 'আবার দেখা হবে' কথাটা বলতে ভুলিনা।যখন কাউকে গাড়ি নিয়ে যেতে দেখি তখন তাদের শুভেচ্ছা জানাই এবং তাদের বলি, 'গাড়ি আস্তে চালাবেন'। ৭:২০ থেকে ৮:১৫ পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকি। সকলের সাথে দেখা করি, সবাই চলে যাওয়ার পর নিজের বাড়ি যাই।

একসাথে গান গাওয়া ও চা পান করতে করতে প্রতিবেশীদের সাথে গল্প করা, আমার মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো মুহূর্ত।

আমি প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় উঠি। সমুদ্রের ধরে হাঁটতে যাই। তারপর বন্ধুদের সাথে বসে চা খাই।বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা করা ও তাদের সাথে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যাওয়া আমার দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির এক বিশেষ রহস্য।

৪. আরামে বাঁচুন:

আরামে ও চিন্তা ছাড়া বাঁচুন, এটা দীর্ঘ জীবন লাভের অন্যতম রহস্য।আপনি যদি জীবনে তাড়াহুড়ো না করেন, তাহলে অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আমি কড়ি দিয়ে জিনিস বানাই, এটাই আমার জীবনের ইকিগাই। আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করি।তারপর ব্যায়াম করে জলখাবার খাই।সকাল সাতটা থেকে কাজ শুরু করি, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করি, কখনও আরও বেশি সময় ধরে কাজ করি।কাজ শেষ করে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে চলে যাই।

প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু করা, সর্বদা ব্যস্ত থাকা, একটা সময়ে একটাই কাজ করা, এটাই আমার দীর্ঘ জীবনের রহস্য।আমি কোনও কাজকে নিজের উপর চেপে বসতে দিইনা, এটাই আমার দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তির সবচেয়ে বড়ো রহস্য।

৫. পজেটিভ থাকুন:

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমি নিজেকে বলি, আজকের দিনটা সুস্থ ভাবে দৃঢ়তার সাথে কাটাবো, আজকের দিনটাকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করার চেষ্টা করবো।

আমার বয়স ৯৮, কিন্তু আমি নিজে একজন যুবক বলে মনে করি, জীবনে আমার অনেক কাজ করতে হবে।

হাসুন, হাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমি যেখানে যাই সেখানেই হাসি।

একশো বছর বাঁচাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য ও প্রেরণা।

ওগিমি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্বদা খুশিতে থাকা।

এই সমাজ আমাকে যা যা দিয়েছে, আমি সবকিছু তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, সেই কারণে যেকোনও সামাজিক কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখি।আমার গাড়ি সর্বদা বন্ধুদের জন্য প্রস্তুত থাকে।

এর পিছনে কোনও রহস্য নেই। বেঁচে থাকাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো রহস্য।

ওগিমি জীবনশৈলী:

আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের সকলের কাছেই সবজির বাগান, চা বাগান, আম ও শিকুবাসার বাগান ছিল।

প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাদের সাথে ঠিকমতো কথাবার্তা বলে ও প্রত্যেকে একে অপরের দেখাশোনা করে।

প্রত্যেকেই একটা সংযমের মধ্যে জীবন কাটায়।তারা ছোট ছোট বিষয়কে উপভোগ করতে জানে।নাচ-গান ও সংগীত তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

তাদের প্রত্যেকের জীবনেই এক বা একাধিক উদ্দেশ্য আছে।তাদের কাছে ইকিগাই খুব স্পষ্ট ছিল, তারা তা নিয়ে কোনও রকম চাপে থাকতো না।

তারা নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে অহংকার বোধ করতো।

কাজ যতই ছোট হোক না কেন, তাদের জীবনে উৎসাহের কোনও ঘাটতি দেখা যায় না।

এখানকার লোকেরা উইমারু অর্থাৎ একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসে।মাঠের কাজ হোক বা বাড়ি তৈরি, সব ক্ষেত্রেই তারা একে অপরকে সাহায্য করে। আমাদের ওখান থেকে রওনা হওয়ার আগের দিন রাতে খাবার খাওয়ার সময় মিয়াগি আমাকে বলে, সকলে মিলে আপনার জন্য একটা ঘর তৈরি করছে, সামনের বার আপনি যখন আসবেন, তখন ওই ঘরে থাকতে পারবেন।

তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকে, কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও কীভাবে আরামে থাকা যায় সেই কলা তাদের জানা আছে।কোনও বয়স্ক ব্যক্তি একা একটা বেঞ্চে বসে আছেন, এমন দৃশ্য কোথাও চোখে পড়েনি। তারা সর্বদা ঘোরে, একে অপরের সাথে কথা বলে, গেট বল খেলে বা করাওকে গাইতে থাকে।

৭

ইকিগাই খাদ্য-সংস্কৃতি

বিশ্বের সর্বাধিক বয়স্ক লোকেদের খাদ্য-সংস্কৃতি

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জাপানের খাদ্যকে বিশ্বের দীর্ঘায়ু সম্পন্ন খাদ্যের সম্মান দিয়েছে।এই সংস্থা মনে করে জাপানের খাদ্য মানুষকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করে। জাপানে পুরুষদের গড় আয়ু ৮৫ এবং মহিলাদের ৮৭.৬ বছর।শুধু তাই নয়, বিশ্বের মধ্যে জাপানেই ১০০ বছর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের জন গণনা অনুসারে গড় আয়ু প্রতি দশ লক্ষতে ৫২০ ছিল।
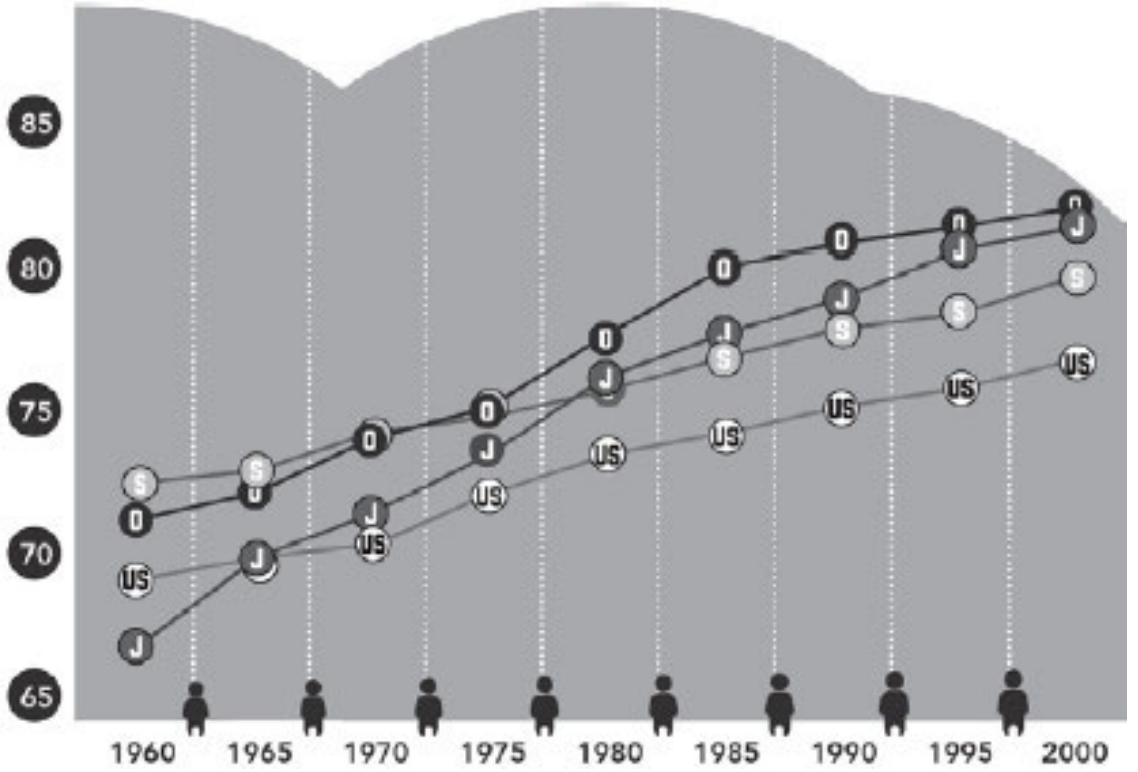
বিশ্বের মানুষদের দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির বিষয়টাই এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য।এতে জাপান, ওকিনাওয়া, সিডনি এবং ইউনাইটেড স্টেটের ওপরে গবেষণা করা হয়েছে। এর থেকে এটা প্রমাণিত যে, সারা বিশ্বের মধ্যে জাপানেই বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে ওকিনাওয়াতে সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওকিনাওয়াকে চরম ক্ষতির মুখ দেখতে হয়েছিল।শুধু যুদ্ধের সময়তেই নয়, এরপরেও এখানকার

লোকেরা খাদ্য ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে এখানকার লোকেদের গড় আয়ু বেশি ছিলনা।কিন্তু সেখানকার লোকেরা সেই দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার পর সেখানকার মানুষরা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে শুরু করেন এবং আজ সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ সেখানেই দেখা যায়।

জাপানে এমন কী রহস্য লুকিয়ে আছে, যার জন্য সেখানকার মানুষরা এমন দীর্ঘ জীবনের আধিকারী হতে সক্ষম? বিশেষ করে ওকিনাওয়ার মানুষদের এমন দীর্ঘ জীবন লাভের পিছনে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

সেখানকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকেরা বলেন, ওকিনাওয়া এমন একটা এলাকা যেখানে ট্রেন যায় না।এখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটাও খুবই কঠিন। এখানকার মানুষরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়ার জন্য সাইকেল বা হাঁটাকেই বেছে নিয়েছেন।সেই সাথে সরকারের বিধি নিষেধ অনুসারে দিনে দশ গ্রামের বেশি নুন এখানকার মানুষরা খায়না, এই নিয়মটি কঠোরতার সাথে পালন করে তারা।

ওকিনাওয়া-র খাদ্য-সংস্কৃতির মধ্যে আছে জাদুর ছোঁয়া:

হৃদরোগে পীড়িত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা ওকিনাওয়া-তে খুবই কম দেখা যায়।এর প্রধান কারণ হল, সেখানকার খাদ্য সংস্কৃতি।আর সেই কারণেই সমস্ত খাদ্য বিশেষজ্ঞদের নজর থাকে ওকিনাওয়া-র দিকে।

মাকোটো সুঝুকি-র লেখা বই-তে ওকিনাওয়া-র খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে বেশ গুরুতর আলোচনা করা হয়েছে।১৯৭০ সালে তিনি ওকিনাওয়া-র খাদ্য সংস্কৃতির উপর

ভিত্তি করে ৭০০ টির বেশি পুস্তক লিখেছিলেন, এবং সেই সবকটি প্রকাশিতও হয়।

তার মধ্যে 'দ্যা ওকিনাওয়া প্রোগ্রাম' নামক পুস্তকটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। তাতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলির দিকে আলোকপাত করা হয়েছে সেই গুলি হল:

এখানকার লোকেরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খান, যার মধ্যে সবজির মাত্রা থাকে প্রচুর পরিমাণে।খাদ্যের মধ্যে এমন বিভিন্নতা তাদের দীর্ঘায়ুর রহস্য হতে পারে। ওকিনাওয়া-র লোকেদের উপর একটা গবেষণা করে দেখা গেছে তারা ২০৬ ধরনের খাবার খান, যার মধ্যে কিছু মশলাও অন্তর্ভুক্ত আছে।তারা দিনে কমপক্ষে ১৮ প্রকার খাবার খান।আমাদের খাদ্য গ্রহণের সাথে তার কোনও মিলই নেই।

তারা দিনে কমপক্ষে পাঁচবার ফল ও সবজি খায়।তারা সারাদিনে সাতটি বিভিন্ন রকমের ফল খায়।আপনি যে খাবার খান তা আপনার শরীরের জন্য ঠিক কিনা তা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হল, আপনার খাবারে রামধনুর রঙ আছে কিনা তা দেখুন।অর্থাৎ আপনার খাবারের মধ্যে লাল ক্যাপসিকাম, গাজর, পালং, কফি ও বেগুন আছে কি না? এর মধ্যে বিভিন্ন রঙ মিশে থাকে। সেই সাথে সবজি, আলু, অংকুরিত ডাল, টোফু প্রভৃতি আপনার থালায় থাকাটা খুবই জরুরি।ওকিনাওয়া-র মানুষরা ৬০ শতাংশের বেশি ক্যালোরি সবজি থেকে পায়।

তাদের খাদ্য-সংস্কৃতির ভিত্তি হল আনাজ।তারা প্রতিদিন ভাত খায়, সেই সাথে নুডলসও খায়। চাল তাদের খাদ্য তালিকার অপরিহার্য উপাদান।

তারা চিনি খুব কম খায়, শুধুমাত্র আখ থেকে যে চিনি পাওয়া যায়, তাই খায়। আমরা অনেক সময় আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে গিয়েছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আখের রসও খেয়েছি আমরা।সেখানকার বহু দোকানে আখের রস বিক্রি হয়, এই আখের রস আপনার শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

সেই সঙ্গে ওকিনাওয়া-র লোকেরা সপ্তাহে তিন দিন মাছ খায়।জাপানের অন্য এলাকায় শুয়োরের মাংস কম পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে তা বেশি পরিমাণে

পাওয়া যায়, তাই সপ্তাহে এক বা দুই দিন তারা শুয়োরের মাংস খায়।

এছাড়া মাকোটো সুঝুকির গবেষণার থেকে আরও বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে, যেমন ধরুন:-

ওকিনাওয়া-র লোকেরা জাপানের বাকি লোকেদের তুলনায় এক-তৃতিয়াংশ চিনি খায়।এর মানে হল তাদের খাদ্য তালিকায় মিষ্টি বা চকলেট জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ খুবই কম থাকে।জাপানের অন্য লোকেদের তুলনায় তারা অর্ধেক নুন খায়। জাপানে প্রতিদিন শতকরা ১২ গ্রাম নুন খাওয়া হয়, অথচ ওকিনাওয়া-তে শতকরা মাত্র ৭ গ্রাম নুন খাওয়া হয়।

জাপানের লোকেরা প্রতিদিন প্রায় ২০৬৮ ক্যালোরি গ্রহণ করে কিন্তু ওকিনাওয়া-র লোকেরা মাত্র ১৭৮৫ ক্যালোরি গ্রহণ করে।বিশ্বের সেই অঞ্চল গুলিতেই বয়স্ক মানুষ বেশি দেখা যায় যেখানকরা মানুষরা কম ক্যালোরি গ্রহণ করে।

হারা হাচি বু:

যেখানে খাদ্যের ক্যালোরি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে আমরা পুনরায় একবার 'হারা হাচি বু' নিয়ে আলোচনা করতে চাই, অর্থাৎ '৮০ শতাংশ খাওয়ার পরামর্শ'। যখনই আপনার মনে হবে পেট ভরে এসেছে কিন্তু আপনি এখনও আর একটু খেতে পারেন, তখনই খাওয়া বন্ধ করে দিন।

হারা হাচি বু-কে কার্যকরী করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল, খাবার খাওয়ার পর আপনার যদি কিছু মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে আজই তা বন্ধ করুন।যে থালায় খাবার খান তা ছোট করুন, আসল কথা হল খাবার খাওয়ার পরেও পেটে সামান্য খিদে থাকাটা জরুরি।এই কারণেই বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায়

জাপানের বাসনের আকার সামান্য ছোট হয়। সেখানকার খাবার 'এপিটাইজর (অর্থাৎ খিদে বৃদ্ধির পদার্থ), মূল খাবার ও শেষ পাতে মিষ্টি' এইভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করে পরিবেশন করা হয়।এই কারণেই সমস্ত খাবার ছোট ছোট থালায় পরিবেশন করা হয়। একটা পাত্রে ভাত, মিশি সুপ ও সেই সাথে এক আধটা অন্য কিছু পরিবেশন করা হয়। ছোট ছোট পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হয়, সেই কারণে বেশি খাবার খাওয়ার সম্ভবনা কমে যায়। তাতে করে একাধিক রকমের খাবার খাওয়া হয়ে যায়।

'হারা হাচি বু'-আসলে একটা প্রাচীন পদ্ধতি।দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন বৌদ্ধ যাজক নিজের ক্ষমতার দুই-তৃতীয়াংশ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার খান, প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ মন্দিরেই এই প্রথা লক্ষ্য করা যায়। ৯০০ বছর আগের বৌদ্ধ যাজকরা জানতেন কম ক্যালোরি গ্রহণের কী কী ভালো দিক আছে।

কম খান, ভরপুর বাঁচুন:

কিছু লোকেরা হয়তো এই বিষয়টা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু কোনও কিছুরই অতিরিক্ত ভালো নয়।প্রয়োজনের তুলনায় কম খান, তবে আপনি কতটা খাচ্ছেন সেটার থেকে বেশি জরুরি আপনি কী খাচ্ছেন। তাই যাই খান না কেন, তা কতটা পুষ্টিকর সেটা বিচার করুন।অনেকটা অখাদ্যের বদলে কম পুষ্টিকর খাবার খান। আপনি যদি অনেক দিন বাঁচতে চান তাহলে কম ক্যালোরি যুক্ত খাবার গ্রহণ করুন।আপনি যদি বেশি ক্যালোরি যুক্ত খাবার খান তাহলে শরীরে অলসতা আসবে, সমস্ত উর্জা খাবার হজম করতেই ব্যয় হয়ে যাবে।

কম ক্যালোরির আর একটা লাভ হল, আইজিএফ-১ (ইনসুলিন-লাইফ গ্রোথ ফ্যাক্টর ১)-এর মাত্রা কম হয়। আইজিএফ-১-এর কারণে বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়।ক্যালোরি কম গ্রহণ করলে আপনার আয়ু বৃদ্ধি পায় কি পায়না সেটা

আলোচনা সাপেক্ষ কিন্তু কম ক্যালোরি নিলে আপনি মোটা হবেন না সেটা একদম সত্য, অন্যদিকে ডায়বেটিজ বা ক্যান্সারের মতো রোগের সম্ভাবনাও অনেকটাই কমে যায়।

৮০ শতাংশ পেট ভরে খাওয়ার প্রক্রিয়া সপ্তাহে এক-দুই দিন উপবাস রাখলেও পূরণ হতে পারে। ৫:২ সূত্র অনুসারে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন উপবাস রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই দুই দিনে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালোরি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বাকি দিন গুলিতে নিয়মানুসারে ক্যালোরি গ্রহণ করতে পারেন।

উপবাসের বেশ কয়েকটা গুণ আছে, তার মধ্যে হজম করার প্রক্রিয়া ভালো হয় এবং আরাম পাওয়ার সম্ভবনাও দেখা যায়।

ওকিনাওয়া খাদ্য-সংস্কৃতির ১৫ প্রাকৃতিক এন্টিঅক্সিডেন্ট:

এন্টিঅক্সিডেন্ট এমন একটা অণু যা পেশী-তে সংগঠিত অক্সিডেশনের প্রক্রিয়াকে ধীরে করে, যা বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেও ধীর করে দেয়।গ্রিনটি এমনই এক প্রাকৃতিক এন্টিঅক্সিডেন্ট।ওকিনাওয়ার লোকেরা প্রায় প্রতিদিন এই এন্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করেন।নিম্নে যে ১৫ টি পদার্থের নাম দেওয়া হল তা তাদের জীবন-শৈলীর অপরিহার্য অঙ্গ:

টোফু

মিসো

টুনা

গাজর

গোয়া (করোলা)

কোম্বু (সমুদ্রে প্রাপ্ত এক ধরনের গাছ)

কফি

নোরী

পেঁয়াজ

সোয়া

হেচিমা (শসার মতো এক ধরনের ফল)

সোয়াবিন (রান্না না করা, সেদ্ধ করে)

রাঙা আলু

মিরপুড

সনপিন-ছা (একধরনের চা)

সনপিন-ছা: মনজয়ের অন্যতম প্রভাবশালী প্রক্রিয়া:

ওকিনাওয়ায় যেদিকে তাকাবেন চায়ের তুলনায় সনপিন-ছা বেশি পরিমাণে দেখতে পাবেন, তা অনেক বেশিমাত্রায় পান করা হয়। এতে গ্রিন-টির সাথে জ্যাসমিন চা মিশ্রিত করা হয়। ১৯৮৮ সালে ওকিনাওয়া ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি-তে হিরোকো শো যে গবেষণা করেছিলেন তাতে পাওয়া যায় জ্যাসমিন চা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম করতে সাহায্য করে।

ওকিনাওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের সনপিন-ছা পাওয়া যায়। তা মেশিনের সাহায্যেও বানানো হয়। এন্টিঅক্সিডেন্ট গ্রিন-টির সাথে জ্যাসমিনের গুণও প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়। এর থেকে:

হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়।

রোগ-প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মানসিক চাপ কমে যায়।

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে।

ওকিনাওয়ার লোকেরা দিনে ৩ কাপ সনপিন-ছা পান করে। সারা বিশ্বে এর চেয়ে ভালো চা আর কোথাও পাওয়া যায়না।কিন্তু গ্রিন-টি ও জ্যাসমিন-টি থেকে আমরা সমপরিমাণ লাভ পেতে পারি।

গ্রিন-টির রহস্য:

আয়ুর্বেদের জগতে গ্রিন-টির ভূমিকা অপরিসীম।আধুনিক জগতে এর অধ্যয়নের পর মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে যে, দীর্ঘায়ু প্রদানের বিষয়ে এটির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমে চিনে এর প্রচলন শুরু হয়, তবে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গিয়েছে।বিগত কয়েক দশকে মানুষ গ্রিন-টি নিয়ে বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে।প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত এই চায়ের বেশ কিছু গুণ আছে, সেগুলি হল:

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

ব্লাড সুগারের মাত্রা কম হয়।

রক্ত প্রবাহের গতি বৃদ্ধি পায়।

ফ্ল্যু-র হাত থেকে অনেকটাই দূরে থাকা যায়।

হাড় মজবুত হয়।

বেশ কিছু জীবাণুর হামলা থেকে বাঁচা যায়।

ইউ.ভি. রশ্মির কারণে হওয়া ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।

শরীরের রক্ত শুদ্ধ হয় এবং মূত্রনালির কার্যের গতি বৃদ্ধি পায়।

হোয়াইট টি:

এর ভেতরে যে পলিফেনোলস আছে তা আমাদের বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ধিমে করে দেয়।এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো মানের এন্টিঅক্সিডেন্ট বলে মনে করা হয়।১২ কাপ কমলালেবুর রস আপনাকে যতটা উর্জা দেয় এক কাপ হোয়াইট চা আপনাকে সমপরিমাণ উর্জা প্রদান করে।

সারাংশ: গ্রিন ও হোয়াইট টি পান করলে আপনার বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ধিমে হয়ে যায়, তাতে করে মানুষকে অনেক বেশি যুবক দেখায়।

শক্তিশালী শিকুবাসা:

শিকুবাসা হল লেবুর মতো দেখতে এক ধরনের ফল।ওকিনাওয়াতে এর ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এই ফলে এসিডের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণের থাকে। জলের সাথে না মিশিয়ে আপনি এই রস পান করতে পারবেন না। এর স্বাদ লেবু বা ম্যান্ডারিন কমলালেবুর মতো হয়।শিকুবাসায় উচ্চমানের নোবিলেটিন থাকে, তার থেকে প্রচুর পরিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। লেবু ও কমলালেবুতে নোবিলেটিন থাকে কিন্তু শিকুবাসায় তা চারগুন বেশি থাকে। নোবিলেটিনের কারণে ক্যান্সার, টাইপ ২ ডায়বেটিজ ও মোটা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

শিকুবাসা-য় 'ক' এবং 'ব' জীবনসত্ত্ব থাকে।বিটা করোটিন এবং মিনারেলস থাকে। বিভিন্ন খাদ্যে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য এর ব্যবহার করা হয়।এর রসও বার করা হয়। সেখানে আমরা এক বয়স্ক ব্যক্তির জন্মদিনে গিয়েছিলাম, আমাদের শিকুবাসার কেক দেওয়া হয়েছিল।

এন্টিঅক্সিডেন্টের উৎস:

২০১০ সালে ইউকে-র ডেলি মিররে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দীর্ঘ আয়ু লাভের জন্য উপযুক্ত খাদ্য তালিকার প্রস্তুত করেছিলেন।এই খাদ্য গুলি সারা বিশ্বের যেকোনও কোণায় সবসময় পাবেন।

ব্রকলি এবং চার্ড এর মতো সবজি, যাতে জল ও ফাইবারের পরিমাণ বেশি মাত্রায় থাকে।

সালমোন, মাক্রে রেল, টুনা এবং সর্বাইন্স এর মতো মাছ।

সিট্রাস, স্ট্রবেরি এবং এপ্রিকট -এর মতো ফল, আমাদের শরীরে টক্সিনের মাত্রা কম করতে সাহায্য করে।

বেরি ও ব্ল্যুবেরি, যাতে প্রচুর পরিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে।

ড্রাইফ্রুট আপনার উর্জা কয়েকগুন বৃদ্ধি করে।

ওটস ও গমের মতো আনাজ যাতে উর্জা ও মিনারেলস থাকে।

অলিভ অয়েল আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে।

এই তালিকায় চিনি, বেকারির খাদ্য সামগ্রী, গরুর দুধের মতো বস্তু গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।ওকিনাওয়ায় যে ধরনের খাদ্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলি খেলে আপনি দীর্ঘ জীবন তো লাভ করবেনই সেই সাথে আপনাকে সর্বদা যুবক দেখাবে।এই খাদ্য গুলি আপনার বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ধিমে করে দেয়।

৮

লয়বদ্ধ ব্যায়াম

সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভের জন্য

ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

ব্লু জোনে যারা বাস করেন তাদের অধ্যয়ন করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল, মানুষেরা ভরপুর ব্যায়াম না করলেও তাদের জীবন সর্বদাই ব্যস্ত থাকে।

আমরা ওগিমি-তে যাওয়ার পর এটা জানতে পারি যে, সেখানে ৮০ থেকে ৯০ বছরের লোকেরা যথেষ্ট কার্যক্ষম।তারা নিজেদের ঘরে বসে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখেনা বা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটায় না।ওগিমি-র বাসিন্দারা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে যায়, তারা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করে,গল্প করে ও গান গায়।সকালের জলখাবার খাওয়ার পর বা তার আগেও তারা নিজেদের বাগানে কাজ করে।সেখানকার বাসিন্দারা কখনই জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেনা, কিন্তু সারাদিন তারা কোন না কোনও কাজ নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখে।

চেয়ার ছেড়ে ওঠার মতো সহজ:

৩০ মিনিট একই জায়গায় বসে থাকলে মেটাবলিজমের প্রক্রিয়া ৯০ শতাংশ কমে যায়।চর্বি গলার প্রক্রিয়া ধিমে হয়ে যায়।আর প্রায় ২ ঘণ্টা বাদে কোলেস্টেরলের মাত্রা ২০ শতাংশ কমে যায়।মাত্র পাঁচ মিনিট নিজের জায়গা ছেড়ে উঠুন, এই প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়ে যাবে।যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করে ব্রডলি সেখানকার সভাপতি, একই স্থানে বসে থাকা আমাদের শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকারক, এই বিষয় নিয়ে তারা গভীর গবেষণাও করেছে।ভাবিন ব্রডলি এবং ব্রিগিড স্কলটে ২০১৫ সালে ওয়াশিংটন পোস্টার একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পাঁচ মিনিট নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে একটা চক্কর লাগিয়ে আসা এতটাই সহজ কাজ যে মানুষ সেই বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দেয়না, আবার অনেক সময় এই কাজ করতে অলসতাও চেপে বসে।

আপনি যদি শহরের বাসিন্দা হন, তাহলে প্রকৃতির কোলে বা শান্ত এলাকায় হাঁটতে যাওয়াটা আপনার জন্য কঠিন হতে পারে,কিন্তু নিজের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য

আপনি হালকা কিছু ব্যায়াম করতেই পারেন।আজ পশ্চিমের দেশ গুলিতে মন শরীর ও বুদ্ধিকে সুস্থ রাখার জন্য বহু যুগ আগে থেকেই কিছু ব্যায়াম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পূর্বের দেশ গুলিতে এই ব্যায়াম গুলি তাদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।যোগ ব্যায়ামের প্রকাশ ঘটেছিল ভারতে, কিন্তু আজ জাপান ও চীনের কুইগাঁগ এবং তাই-চি-তে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। এর সাহায্যে মানুষের শরীর ও মন দুইই সুস্থ থাকে।এটা অবিশ্বাস করার কোনও স্থান নেই যে, এর সাহায্যে আমরা জীবনের ঘটনাগুলিকে অনেক বেশি আনন্দ,শক্তি এবং জোশের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।

সর্বদা যৌবন ধরে রাখার অন্যতম উপায় হল যোগ ব্যায়াম, আর বিজ্ঞানও সেই কথা অস্বীকার করতে পারেনি।এর সাহায্যে শরীরে বেশ কিছু অসাধারণ লাভ দেখতে পাওয়া যায়।বিশেষ করে বয়স্ক লোকেদের জন্য যোগ ব্যায়াম খুবই লাভ জনক বলে প্রমাণিত।

যারা তাই-চি-র অভ্যাস করে তাদের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস এবং পার্কিনন্সন-এর মতো অসুখ খুব কম দেখা যায়। তাদের শরীর অনেক বেশি সুস্থ থাকে এবং সঠিক মাত্রায় রক্ত প্রবাহ দেখা যায়।তাদের মানসিক বিকাশও খুব ভালো হয়, তা মানসিক চাপ বা নিরাশার সময় ঢালের মতো কাজ করে।

প্রতিদিন জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতেই হবে বা ম্যারাথন রেসে ভাগ নিতেই হবে, এমন কোনও মানে নেই।জাপানের যে সমস্ত মানুষরা দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছে তারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত বিভিন্ন রকম গতিবিধির মধ্যে অতিবাহিত করতে পারলেই দীর্ঘায়ু লাভ করা সম্ভব হয়। জাপান ও চীনের সংস্কৃতি বলে, যেকোন ব্যায়াম করলেই আমরা বড়ো ধরনের লাভ পেতে পারি।এই ব্যায়াম গুলি খুবই সহজ ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এটাই সবচেয়ে লাভজনক বিষয়। এইভাবে অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত ব্যায়ামের অভ্যাস বজায় রাখতে পারলে আপনি ভালো ফল লাভ করতে পারবেন। এর মধ্যে কোনও ব্যায়ামই যদি আপনার করতে ইচ্ছা না করে তাহলে নিজের পছন্দানুসারে ব্যায়াম করুন, সেটাতেই আপনি লাভবান হবেন।

সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য, পরবর্তী কয়েকটা পৃষ্ঠায় আমরা এই বিষয়েই আলোচনা করবো।কিন্তু জাপানের একটা ছোট্ট ব্যায়াম দিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করবো।

রেডিও তাইসো:

এই ব্যায়াম সকালে করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানে এর প্রয়োগ শুরু হয়।এর নামের সাথেই রেডিও কথাটা যুক্ত আছে, তা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, সেই সময় রেডিও-র মাধ্যমেই এই ব্যায়ামের বার্তা দেওয়া হত।আজ লোকেরা টি.ভি. বা ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যায়াম করেন।রেডিও তাইসো-র মুখ্য উদ্দেশ্য হল, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জোশ ও একতার ভাবনা গড়ে তোলা।স্কুলে পড়া শুরু হওয়ার আগে বা কম্পানিতে কাজ শুরু হওয়ার আগে এই ব্যায়াম করানো হয়।

যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, সেই অনুসারে জাপানের ৬০ শতাংশ লোক প্রতিদিন এই রেডিও তাইসো ব্যায়াম দিয়েই নিজেদের জীবন শুরু করেন।ওগিমি-তে আমরা যাদের সাথে কথা বলেছিলাম তাদের মধ্যে ১০০ শতাংশ মানুষই এই ব্যায়াম দিয়ে নিজেদের জীবন শুরু করেন।শুধু তাই নয়, আমরা যে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানকার লোকেরাও সকালে পাঁচ মিনিট এই ব্যায়াম করেই নিজেদের দিন শুরু করে।কিছু লোকেদের তো চেয়ার থেকে ওঠার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু তারা চেয়ারে বসেই এই ব্যায়ামে অংশ গ্রহণ করতো। আমরাও তাদের সাথে ব্যায়াম করি এবং সারাটা দিন জোশের সাথে অতিবাহিত করি।সকলে মিলে এই ব্যায়াম করে, তাই অনেক বড়ো হলঘর বা মাঠে এই ব্যায়াম করানো হয়।এই সময় বার্তা প্রেরণের জন্য লাউডস্পিকার বা মাইকের ব্যবহার করা হয়।

আপনি কোন ব্যায়াম করতে চান, সেই অনুসারেই আপনাকে সময় নির্ধারণ করতে হবে।মনের চাপ দূর করা ও মানসিক ভাবে আপনাকে নমনীয় করে তোলাই এই ব্যায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য। সবচেয়ে সহজ রেডিও তাইসো ব্যায়াম হল নিজের আঙ্গুল গুলি ওপর দিকে টানা এবং গোলাকার পদ্ধতিতে সেইগুলি নিচে নিয়ে আসা।এটা খুবই হালকা পদ্ধতির ব্যায়াম, এতে সারা শরীরের অঙ্গ ও পেশী গুলির মধ্যে নমনীয়তা বজায় রাখাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।

হয়তো এটা আপনার কাছে খুব সহজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আজকের আধুনিক জগতে আমরা বিনা দরকারে নিজের হাতটা কানের ওপরে নিয়ে যাওয়াও পছন্দ করিনা।আমরা যখন কম্পিউটারে কোন কাজ করি, মোবাইল ফোন নিয়ে কিছু করি বা রান্না করি তখন আমাদের হাতটা নিচের দিকেই থেকে যায়। যখন আমরা আলমারির ওপর দিকে রাখা কোনও কিছু বার করতে চাই তখন আমরা নিজেদের হাত ওপর দিকে তুলি।আগেকার দিনে লোকেরা গাছ থেকে ফল পারতো, সেই সময় তাদের হাত ওপর দিকে যেত।রেডিও তাইসো আমাদের সেই কাজ করতে সাহায্য করে।
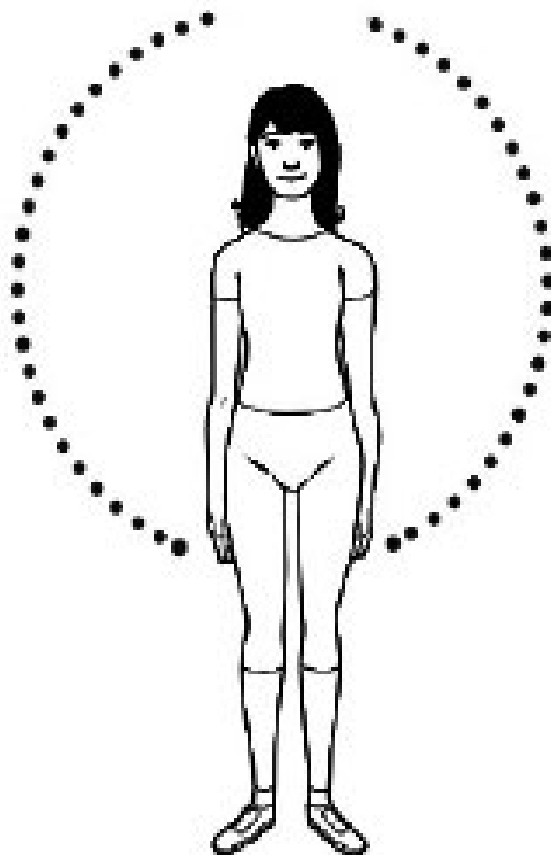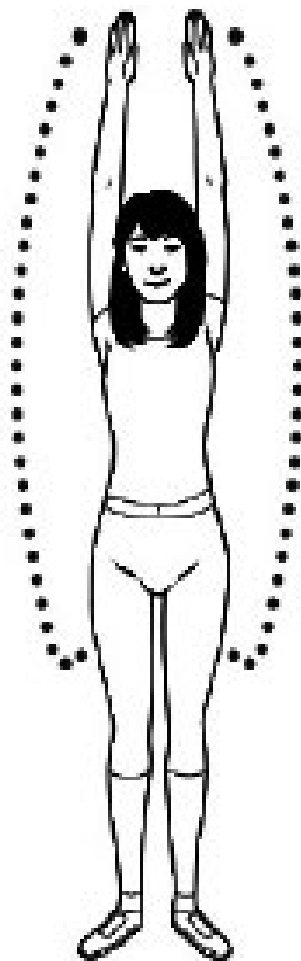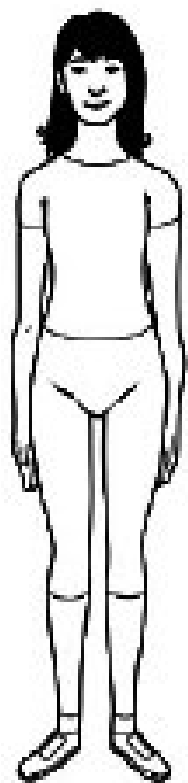
রেডিও তাইসো ব্যায়ামের প্রাথমিক স্বরূপ (৫ মিনিট)
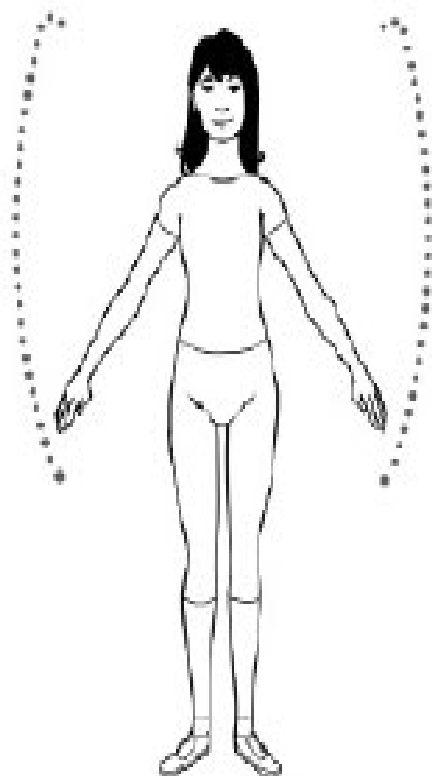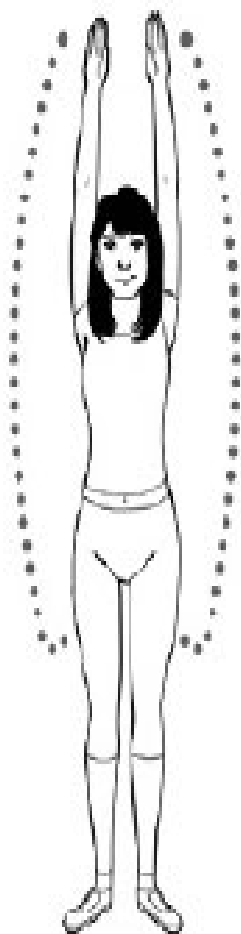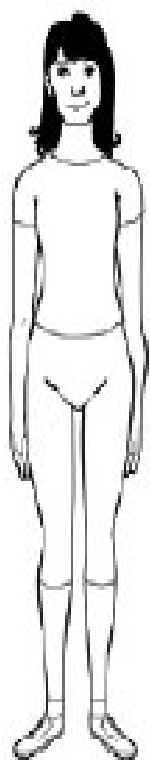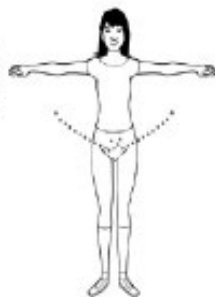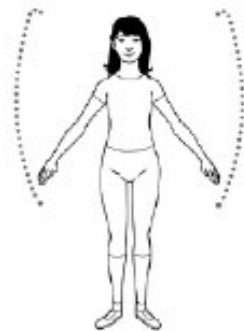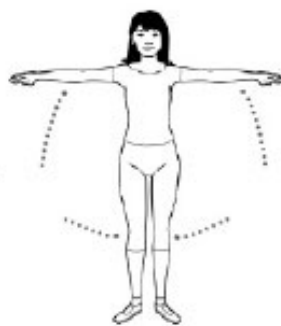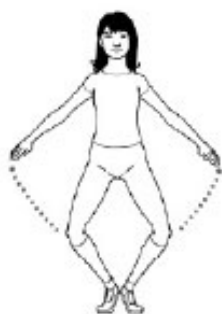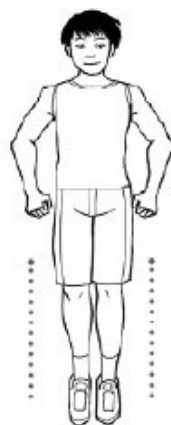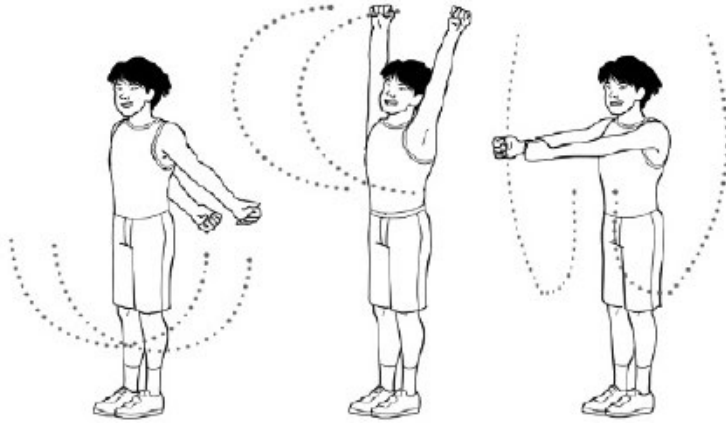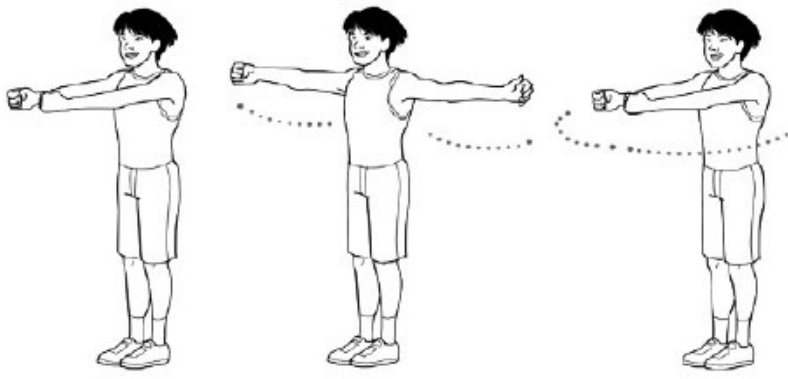
যোগ:

ভারত, চীন, জাপান সহ বিশ্বের বহু দেশেই যোগ আজ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।এই ব্যায়াম যেকোনও ব্যক্তি করতে পারে।এই ব্যায়ামের এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যা গর্ভবতী মহিলা ও বিকলাঙ্গদের জন্য উপকারী।হাজার বছর আগে ভারতের মাটিতেই যোগ ব্যায়াম প্রথম শুরু হয়েছিল।শরীর ও মনকে একত্রিত করার জন্য এর শুরু করা হয়।সংস্কৃতে যোগ শব্দের অর্থ হল দুটি বিষয়কে যুক্ত করা।যোগ আমাদের মন শরীরকে সংযুক্ত করে, এমন জীবন-শৈলী প্রদান করে যাতে করে আমরা বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হতে পারি।

যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য:

আমাদের মূল ধর্মের (স্বভাবের পরিচয়) সাথে পরিচিত হওয়া।

শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধতা।

আমাদের চৈতন্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

যোগের প্রকার ভেদ:

এমনিতে সমস্ত প্রকারের অভিপ্রায় একই রকম, তা সত্ত্বেও ভিন্ন সংস্কৃতি ও রীতির কারণে তার প্রকার বিভিন্ন হয়।যাঁরা এই যোগের প্রচার ও প্রসার করেছেন তাঁরা সময়ানুসারে তাতে পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন।

জ্ঞানযোগ: অনুশাসন ও মানসিক বিকাশের জন্য এই ব্যায়াম করা হয়।এতে জ্ঞান মার্গের সাহায্যে খোঁজ করা হয়।

কর্মযোগ: সমাজ ও আমাদের ভালোর কথা ভেবে কাজের প্রতি জোর দেওয়া।

ভক্তিযোগ: চৈতন্যকে সমর্পিত করে ভক্তির সাথে করা যোগ।

মন্ত্রযোগ: মন্ত্রউচ্চারণের সাহায্যে শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভের প্রকার।

কুণ্ডলিনী যোগ: শরীরের ভিন্ন বিষয় গুলি একত্রিত করে মানসিক বিকাশ প্রাপ্ত করা।

রাজযোগ: একে রাজমার্গও বলা হয়।সব একত্রে মিলিয়ে লাভের অভিমুখে যাত্রা করা।

হঠযোগ: জাপান বা পশ্চিমের দেশ গুলিতে এই প্রকারটি খুবই জনপ্রিয়।বিভিন্ন আসনের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত স্থিরতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

সূর্য-প্রণাম করার পদ্ধতি:

হঠযোগের সর্বাধিক বিশিষ্ঠ ক্রিয়া হল সূর্য-প্রণাম।এতে আপনাকে ১২ টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।

সবার আগে সোজা হয়ে দাঁড়ান।তারপর দুটি হাত কাঁধের সমান্তরালে নিয়ে যান। হাত দুটি ওপর দিকে তুলুন।হাতের তালু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করুন।ওই ভাবেই হাত দুটি সামনের দিকে নিয়ে আসুন, দুটি হাতের তালু যেন একে অপরের সাথে আটকে থাকে। তারপর নিজের দিকে গোল করে ঘুরিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকুন।

এবার লম্বা শ্বাস নিন, হাত দুটি ওপর দিকে নিয়ে যান। এবার হাত ও কোমর ধীরে ধীরে পিছন দিকে বেঁকান, আপনার গলাও কিন্তু পিছন দিকে বাঁকবে।

এইভাবে সামনের দিকে ঝুঁকুন ও ধীরে ধীরে শ্বাস বায়ু ত্যাগ করুন।হাত দুটি ঘাড়ের সাথে, কানের সাথে লাগিয়ে নিচের দিকে নিয়ে যান এবং হাত দুটি দিয়ে মাটি স্পর্শ করুন।এবার কিছুক্ষণ এই রকম অবস্থায় থাকার পর হাঁটু দুটি একদম সোজা করে দিন।

এই অবস্থায় হাতের তালু দুটি মাটিতে রাখুন।শ্বাস নিন ও ডান পা পিছন দিকে নিয়ে যান।এবার ঘাড় ওপর দিকে তুলুন, এই অবস্থায় খানিকক্ষণ থাকুন।

এই অবস্থায় ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করুন ও বাম পা পিছনের দিকে নিয়ে যান। মনে রাখবেন, এই অবস্থায় দুটি পায়ের গোড়ালি কিন্তু একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে।এবার ঘাড় নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে থুতনিটা গলার সাথে লাগানোর চেষ্টা করুন।

এই অবস্থায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিন এবং শরীর পৃথিবীর সমান্তরালে রাখুন।দণ্ডবৎ প্রণামের সময় আপনার শরীরের অবস্থান যেমন থাকে এখনও তেমনি সমান্তরাল রাখুন। এবার হাঁটু,বক্ষদেশ ও থুতনি ভূমি স্পর্শ করান, ধীরে ধীরে বক্ষদেশ ওপর দিকে নিয়ে গিয়ে শ্বাস ছাড়ুন।

এই অবস্থায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিন বক্ষদেশ সামনের দিকে টানুন। হাত দুটি সোজা রাখুন হাতের তালু যেন ভূমি স্পর্শ করে।এবার ধীরে ধীরে ঘাড় পিছন দিকে নিয়ে যান, হাঁটু মাটিকে স্পর্শ করবে এবং পায়ের পাতা সোজা থাকবে।

এই অবস্থান পঞ্চম স্থিতির সমান। এই অবস্থায় শ্বাসবায়ু ধীরে ধীরে ত্যাগ করুন ও বাম পা পিছন দিকে নিয়ে যান।মনে রাখবেন এই অবস্থায় দুটি পায়ের গোড়ালি একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে।এবার ঘাড় নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে থুতনিটা কন্ঠের সাথে লাগানোর চেষ্টা করুন।

এই স্থিতি চতুর্থ স্থিতির সমান। এই অবস্থায় হাত দুটি মাটিতে ঠেকান।শ্বাস নিন ও ডান পা পিছন দিকে নিয়ে যান। এবার ঘাড় ওপরের দিকে তুলুন। এবার কিছুক্ষণ এই অবস্থাতেই থাকুন।

এই স্থিতি তৃতীয় অবস্থানের সমান। এই অবস্থায় সামনের দিকে ঝুঁকে শ্বাসবায়ু ধীরে ধীরে বাইরে নির্গত করুন।হাত ঘাড়ের সাথে, কানে স্পর্শ করে নিচের দিকে নিয়ে যান, আর নিজের হাত দিয়ে পৃথিবী স্পর্শ করুন।কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকুন এবং হাঁটু দুটি সোজা রাখুন।

এই পরিস্থিতি দ্বিতীয় স্থিতির সমান।এতে ধীরে ধীরে শ্বাস বায়ু ভেতরে নিন, হাত দুটি কানের সাথে স্পর্শ করে ওপর দিকে টানুন, হাত ও ঘাড় পিছন দিকে ঝোঁকান।

এই স্থিতি প্রথম স্থিতির সমান।

সূর্য-প্রণাম

তাই-চি:

ত আই চ উয়ান (তাইজিকোয়ান)নামে পরিচিত 'তাই-চি' ব্যায়াম জাপানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুশিয়াসের ধর্মেও এর উল্লেখ আছে। এটা চীনের মার্শাল আর্টের একটা প্রকারভেদ। জাপানে এটা খুবই জনপ্রিয়।

চীনের সংস্কৃতি অনুসারে, তাওইস্ট গুরু এবং মার্শাল আর্টের গুরু ঝাং সনফেং এর সন্ধান করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ং লুচান সারা পৃথিবীতে এর প্রসার করেন।

প্রধানত তাই-চি-র শুরু নেইজিয়া, অর্থাৎ অন্তরঙ্গ মার্শাল আর্টের জন্য করা হয়েছিল।ব্যক্তিগত উত্থানের জন্য এর বিকাশ ঘটানো হয়।কীভাবে বুদ্ধির সাহায্যে কম উর্জার ব্যবহার করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানো যায়,এখানে সেই কৌশলই শেখানো হয়।এতে অন্যকে আক্রমণ করার বদলে কীভাবে নিজেকে বাঁচাবেন সেই কলা শেখানো হয়।

তাই-চি-র অর্থ শরীর ও মনের উপাচার।আন্তরিক শান্তি ও সন্তুষ্টির জন্য এর প্রয়োগ করা হয়।দেশের লোকেদের সুস্থ ও সবল রাখার জন্য চীনের সরকার নিজের উদ্যোগেই তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

তাই-চি-র প্রকার:

তাই-চি শেখানোর জন্য অনেক গুলি স্কুল আছে।তার অনেক প্রকার ভেদও আছে, তার মধ্যে কয়েকটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল:

চেন স্টাইল: ধীর অথচ আকস্মিকতার মেলবন্ধন।

ইয়ং স্টাইল: সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, এই পদ্ধতিও ধীর গতিতে হয় এবং দ্রব্য পদার্থের ব্যবহার করা হয়।

ভু স্টাইল: ছোট-ছোট অথচ সজাগ পদক্ষেপ।

হাও স্টাইল: নিজের ভেতরে দেখুন ও সূক্ষ্মতার সাথে আলোড়ন ঘটান।এই বিধিটি সারা বিশ্বেই নয় বরং চীনেও এর প্রয়োগ কমই করা হয়।

এই প্রতিটা স্টাইল একে অপরের থেকে আলাদা ঠিকই কিন্তু এদের উদ্দেশ্য একটাই, যেমন:

স্থিরতার সাহায্যে নিজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা।

কুশলতার সাহায্যে শক্তিকে জয় করা।

দ্বিতীয় নম্বরটি সরিয়ে দিয়ে প্রথম স্থানে পৌঁছানো(প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে জেতার সুযোগ দিয়ে, ধীরে ধীরে নিজেকে এগিয়ে দেওয়া ও শেষে জয় প্রাপ্ত করা।)

নিজেকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেনা।(নিজের এবং সামনের ব্যক্তির সবলতা ও দুর্বলতা গুলি জেনে নেওয়া)

তাই-চি-র ১০টি প্রধান সিদ্ধান্ত:

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সম্পূর্ণ লক্ষ্য নিজের মাথায় কেন্দ্রিত করা।

প্রথমে পিঠের স্নায়ু গুলিতে চাপ সৃষ্টি করুন এবং ধীরে ধীরে তা শিথিল করে দিন।

কোমরে আরাম দিন ও শরীরের বাকি অংশ গুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনুন।

আমাদের শরীরের ওজন কীভাবে বিভাজিত হয়েছে, তা জেনে জড়তা ও হালকাবোধের মধ্যে অন্তর বুঝে নিন।

সহজেই হাতের ব্যবহার করে শরীরের উর্জার প্রবাহ বৃদ্ধি করুন।কাঁধ আরামে রাখুন।

শরীরের থেকে মনের গতি-বিধিকে বেশি গুরুত্ব দিন।

শরীরের ওপরের ভাগ ও নিচের ভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করুন।

মন, শরীর ও শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণে রাখা।

নিজের ভেতরের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ না করে নমনীয়তা ও লয়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিন।

প্রতিটা মুহূর্তের মধ্যে যে শান্তি ও স্থিরতা আছে তার খোঁজ করুন।শরীর কাজ করতে থাকলে মন নিজের থেকেই শান্ত হয়ে যায়।

মেঘের অনুকরণ:

তাই-চির যতগুলি প্রক্রিয়া আছে, তারমধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হল মেঘের মতো হাত-পা নাড়ানো।নিম্ন লিখিত পদ্ধতির সাহায্যে তা করা যেতে পারে:

হাত দুটো সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে তালু গুলি নিচের দিকে রাখুন।

আপনি যেন কোনও গাছের কাণ্ডকে আলিঙ্গন করছেন এমন মুদ্রা গড়ে তুলুন।

ওই সময় আপনার হাতের তালু বাইরের দিকে থাকবে।

বাম হাত ওপর থেকে মধ্যের দিকে এবং ডান হাত নিচ থেকে মধ্যের দিকে নিয়ে যান।

বলের মতো নিজের শরীরের সামনে হাত নাড়ান।

বাম হাতের উপরিভাগ সামনের দিকে নিয়ে আসুন।

হাতের মুভমেন্টের দিকে খেয়াল রেখে বাম পায়ে শরীরের সম্পূর্ণ ওজন দিয়ে কোমর ঝোঁকান।

নিজের বাম হাত কোমরে এবং ডান হাত মুখের সামনে নিয়ে আসুন।

নিজের ওজন ডান পায়ের ওপর রাখুন।

ডান দিকে ঘুরুন এবং নিজের ডান হাতের দিকে লক্ষ্য করে তা ওপরে তুলুন।

এবার নমনীয়তার সাথে হাতের মুভমেন্ট করুন।

হাত পুনরায় লম্বা করুন এবং ধীরে-ধীরে তা আগের অবস্থানে নিয়ে যান।

কিউগাঁগ:

চি-কুঙ্গ নামে পরিচিত এই ব্যায়ামের প্রকার দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত।কিউ (জীবনের চেতনা, উর্জা) এবং গাঁগ (কাজ।এর অর্থ হল এমন কাজ করা যাতে আপনি চেতনার সাথে যুক্ত হতে পারেন।আজকের এই আধুনিক কর্মজীবনে আমরা মন ও শরীরকে যুক্ত করে তার সাহায্যে নিজের সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে পারি।
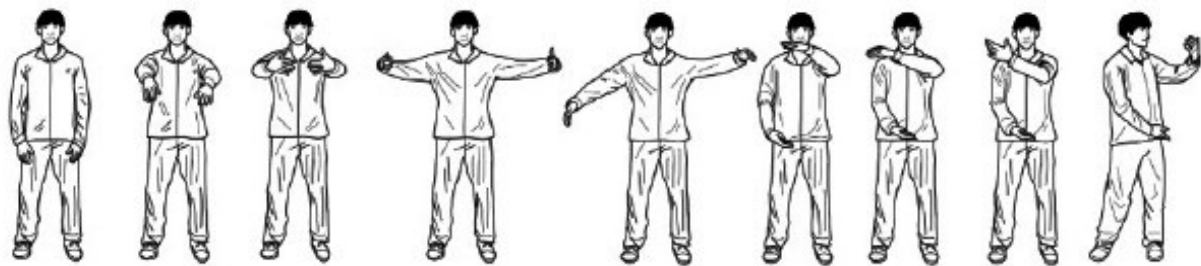
কথায় বলে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই মার্শাল আর্টের আগমন ঘটে এবং ১৯৩০ সাল থেকে হাসপাতালেও এর ব্যবহার হতে শুরু করে।এরপর চীনের সরকার তাই-চি-র মতো এই ব্যায়ামকেও জন সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে।

কিউগাঁগ-এ সাধারণত শ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়াতেই বেশি জোর দেওয়া হয়।আমরা যখন বসে থাকি বা দাঁড়িয়ে থাকি বা আমাদের শরীর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন নিজের শ্বাস নিয়ন্ত্রণে এনে আমরা তা স্থির রাখতে পারি।কিউগাঁগ-এর যত গুলিই প্রকার থাকুক না কেন, উদ্দেশ্য একটাই আর তাহল উর্জা বৃদ্ধি করা।যদিও ভেতরের আন্দোলন ধীর গতিতেই সম্পন্ন হয় এবং তা খুবই সংযত থাকে।

কিউগাঁগ-এর লাভ:

বেশ কিছু গবেষণার থেকে জানা গিয়েছে, তাই-চি ও যোগ যেমন আমাদের শরীরের জন্য উপকারী তেমনি কিউগাঁগ-ও আমাদের জন্য খুবই উপকারী।এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন ড. কেনেথ এম. সানসিয়র, তিনি নিজের একটি তথ্য ভিত্তিক লেখায় এর উপকারিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখেন:

মস্তিষ্কে সৃষ্ট তরঙ্গের বিকাশ ঘটে।

হরমোনসের ক্ষেত্রে পজেটিভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেকটা কম হয়।

রক্তচাপ জনিত অসুখের সম্ভাবনা কমে যায়।

শরীরের হাড় সবল হয়ে ওঠে।

রক্ত প্রবাহের গতি সচল থাকে।

বার্ধক্য জনিত কারণে হওয়া রোগের সম্ভাবনা অনেকটাই দূর হয়।

শরীরের অঙ্গ গুলি সচল থাকে ও তা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে।

মস্তিষ্ক খুব ভালোভাবে রক্ত পায় এবং মন ও মস্তিষ্কের মিলন খুব ভালো থাকে।

হার্ট খুব ভালো ভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

ক্যান্সারের রোগীরা এর সাহায্যে বিভিন্ন দুষ্পরিণামের হাতে থেকে রেহাই পেতে পারে।

এই ব্যায়ামের সাহায্যে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে এবং সেই সাথে আমরা দীর্ঘায়ু লাভ করি।

কিউগাঁগ করার পদ্ধতি:

কিউগাঁগ-এর ব্যায়াম করার আগে আমাদের এটা জানতে হবে, আমাদের সারা শরীর উর্জা পরিপূর্ণ।শরীরের মধ্যে যে উর্জা আছে, কীভাবে তার সঠিক ব্যবহার করবেন, সবার আগে আমাদের সেটাই জানতে হবে।

ত্যাও শেন (শরীরের প্রয়োগ): সঠিক মুদ্রায় বসুন, মাটিতে বসাটা খুবই জরুরি।

ত্যাও শিয় (শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ): ধীরে শ্বাস নিন, তা যেন সংযত ও শান্ত হয়।

ত্যাও হসিন (মনের নিয়ন্ত্রণ): এই স্টেপটা খুবই কঠিন।কারণ এই সময় আপনার মনকে বিচার শূন্য করতে হবে।

ত্যাও চি (উর্জা নিয়ন্ত্রণ): প্রথম তিনটি ধাপের সঠিক সমন্বয়ের পর উর্জা সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।

ত্যাও শেন (চেতনার প্রবিধান): দ্যা ইসেন্স অফ তাই জি কিউগাঁগ-তে ইয়ংজবিং মিঙ্গ বলেছেন চেতনার শক্তির সাথে সাথে ভিত্তিও।

এইভাবে সারা শরীর একত্রিত হয়ে একই অভিমুখে কাজ করে, এবং একই লক্ষ্যের জন্য কাজ করতে থাকে।

কিউগাঁগ-এর পাঁচটি সিদ্ধান্ত:

কিউগাঁগ-তে পাঁচটি বিষয়ের ওপর কাজ করা হয়। যেমন- পৃথিবী, জল, কাঠ, ধাতু এবং আগুন। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে পাঁচ ধরনের উর্জার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায়, যার ফলে শরীরের অঙ্গ ও মস্তিষ্কের কার্য বিকশিত হয়।

এই ব্যায়াম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় করা হয়।আমরা কিউগাঁগ ইনস্টিটিউট ইন বার্সিলোনা-র মারিয়া ইসাবেল গার্সিয়া মেনরিল-এর পদ্ধতি দেখবো।

পৃথিবী:

আপনার দুটি পায়ের মধ্যে কাঁধের সমান ফাঁক রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

এরপর আপনি দুটি পায়ের ফাঁক সামান্য বৃদ্ধি করুন, যাতে সহজেই দাঁড়াতে পারেন।

নিজের কাঁধটা সামান্য ঝোঁকান এবং নিজের শরীর ঢিলা ছেড়ে দিন, আপনার হাত দুটিও আলগা করে দিন।(এটা 'বু'-এর অবস্থান)

শ্বাস নেওয়ার সময় আপনার হাত দুটি কাঁধ পর্যন্ত তুলুন।এইসময় হাতের তালু নিচের দিকে থাকবে।

আপনি যখন শ্বাস বায়ু ছাড়বেন তখন নিজের হাঁটু সামান্য মুড়ুন এবং হাত দুটি পেট সমান নিচে নিয়ে আসুন।সেই সময় হাতের তালু ভেতর দিকে থাকবে।

কিছুক্ষণের জন্য এমনই থাকুন ও নিজের শ্বাসবায়ুর দিকে সমস্ত ধ্যান কেন্দ্রিত করার চেষ্টা করুন।
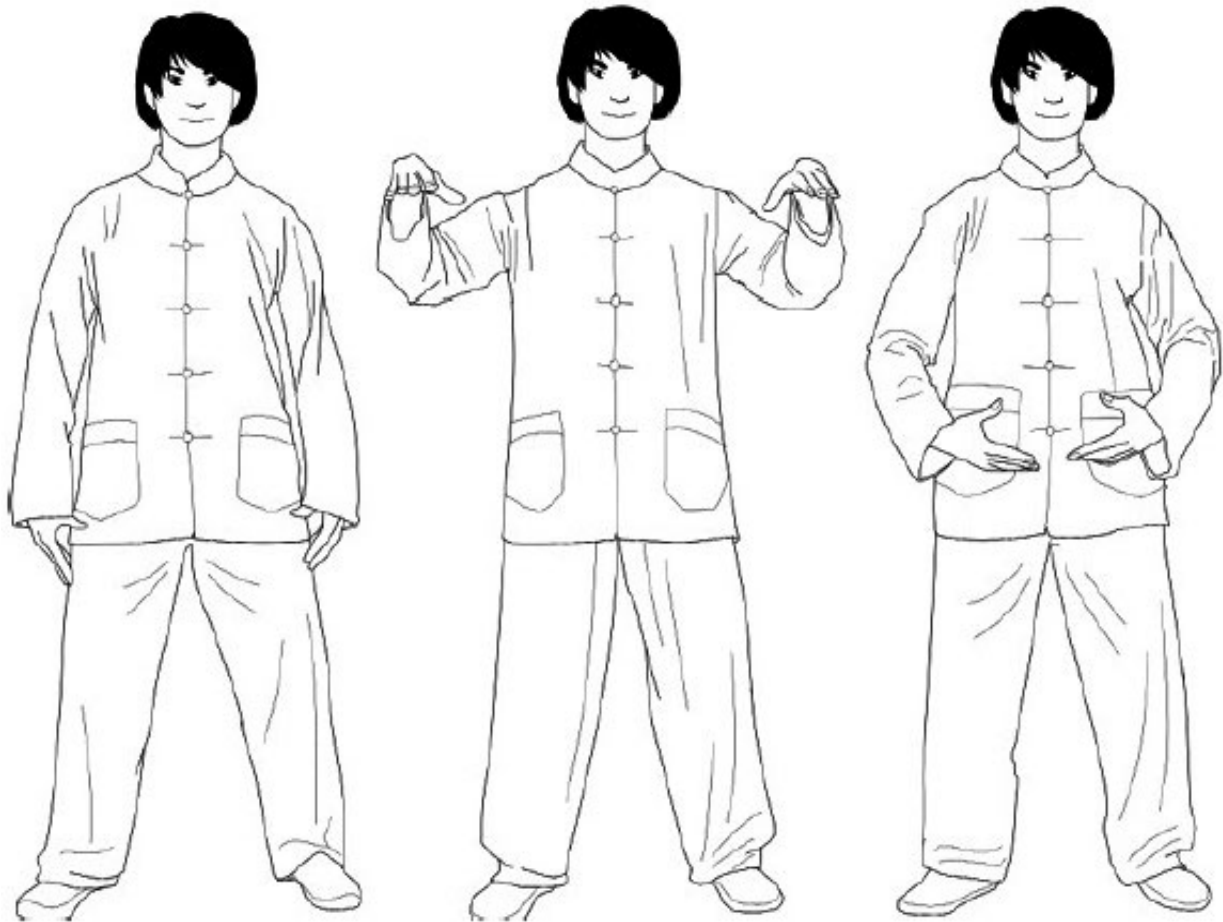
জল:

পৃথিবীর অবস্থা থেকে শুরু করা যাক।হাঁটুর উপর ঝুঁকুন এবং বুক সোজা করে নিচের দিকে বসুন।

আপনার মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে।

আপনি যখন পুনরায় শ্বাস নেবেন তখন পৃথিবীর দিকে ফিরে আসুন।

এইভাবে তিনবার করুন।

কাঠ:

পৃথিবীর অবস্থান থেকে শুরু করুন।শ্বাস নিতে নিতে হাত ওপর দিকে করুন আর তারপর একদিকে নিয়ে গিয়ে গোলাকার করার চেষ্টা করুন।এমন করতে করতে হাত দুটি ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান।হাত ও কুনুই একই সরলরেখায় থাকবে।

এরপর শ্বাস ছাড়ার সময় ওই ক্রিয়ার উল্টোটা করুন।পুনরায় আগের স্থানে চলে আসুন।

শ্বাস নেওয়ার সময় হাত একে অপরের থেকে আলাদা রাখুন, আর তার মধ্যে কাঁধ সমান ফাঁক রাখুন।
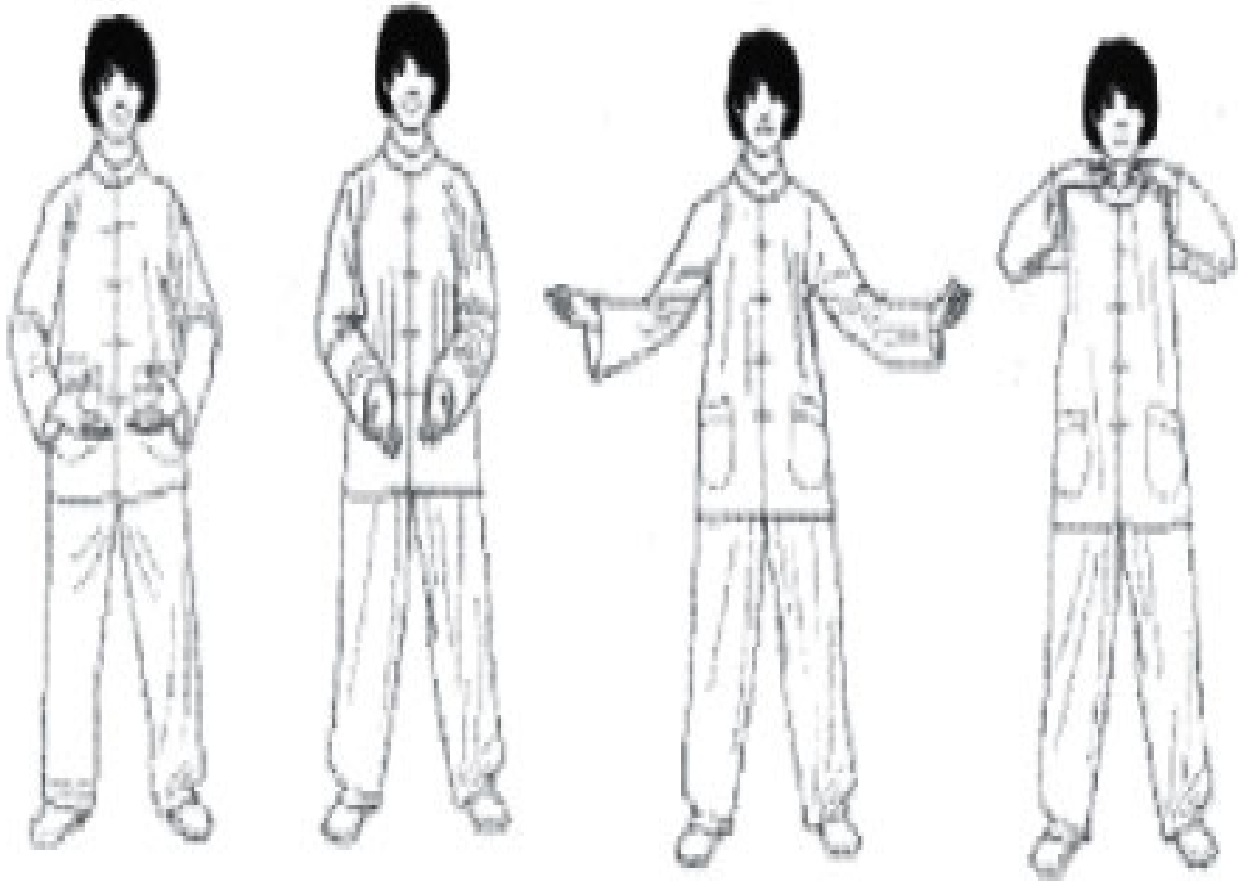
ধাতু:

পৃথিবীর অবস্থান থেকে শুরু করুন এবং নিজের হাত দুটি বুক পর্যন্ত তুলুন।

আঙ্গুল গুলি একে অপরের থেকে সামান্য আলাদা রেখে ওপরের দিকে ইশারা করুন, হাত দুটি একে অপরের থেকে চার ইঞ্চি লম্বা রাখুন।

শ্বাস নেওয়ার সময় হাত একে অপরের থেকে আলাদা রাখুন, আর তার মধ্যে কাঁধ সমান ফাঁক রাখুন।

শ্বাস ছাড়া সময় দ্বিতীয় পয়েন্টে যা বলা হয়েছে পুনরায় সেটাই করুন।

এই গতিবিধি তিনবার করতে হবে, আপনি যখন নিজের হাত দুটি একে অপরের কাছে নিয়ে যান ও আবার দূরে করেন তখন তার মধ্যে যে উর্জার সৃষ্টি হয়, তা অনুভব করার চেষ্টা করুন।
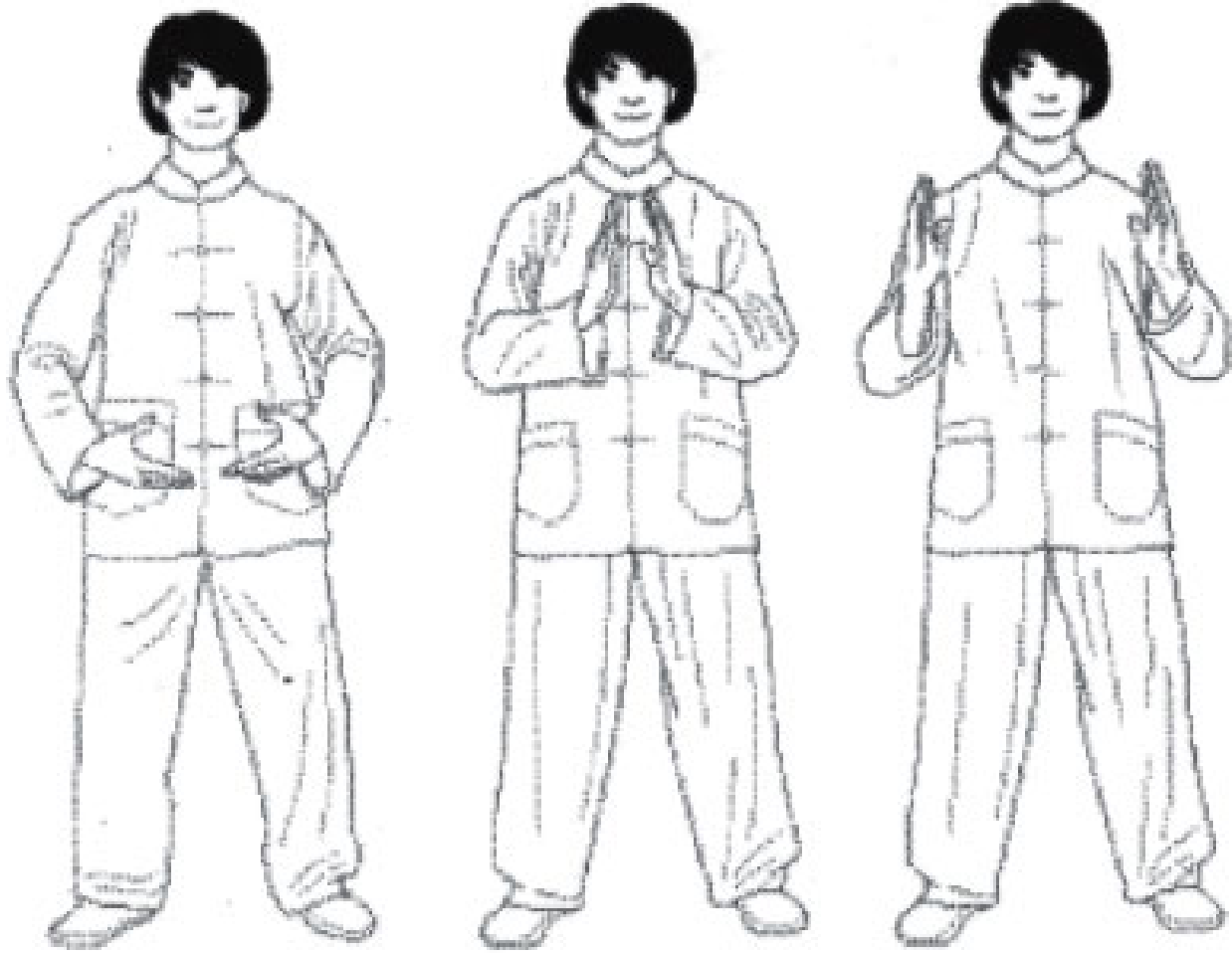
আগুন:

পৃথিবী আসন থেকে শুরু করুন।শ্বাস নিন ও হাত দুটি একে অপরের সাথে রাখুন, দুটি হাতের মধ্যে ফাঁক রেখে তা বুক সমান ওপরে নিয়ে যান।

নিজের হৃদয়ের উর্জা অনুভব করার জন্য হাত ঘোরান।

কোমর থেকে বাম দিকে বেঁকে যান এবং নিজের হাত দুটি মাটির সমান্তরাল রাখুন ও ওপর নিচ করুন।

হাত দুটি একে অপরের দিকে রাখুন ও তা একে অপরের থেকে দূরে নিয়ে যান। ওপরের হাত কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যান ও নিচের হাত কোমর পর্যন্ত।

এবার নিজের হাত দুটি ভূমির সমান্তরাল রাখুন, কোমর থেকে ডান দিকে মুরুন ও ওপর নিচ করুন।

শ্বাস ছাড়ার সময় নিজের হাত দুটি হৃদয়ের কাছে নিয়ে যান।

হাত দুটির মধ্যে পুনরায় দূরত্ব তৈরি করুন।ওপরের হাত কাঁধ পর্যন্ত আর নিচের হাত কোমর পর্যন্ত নিচে নামান।
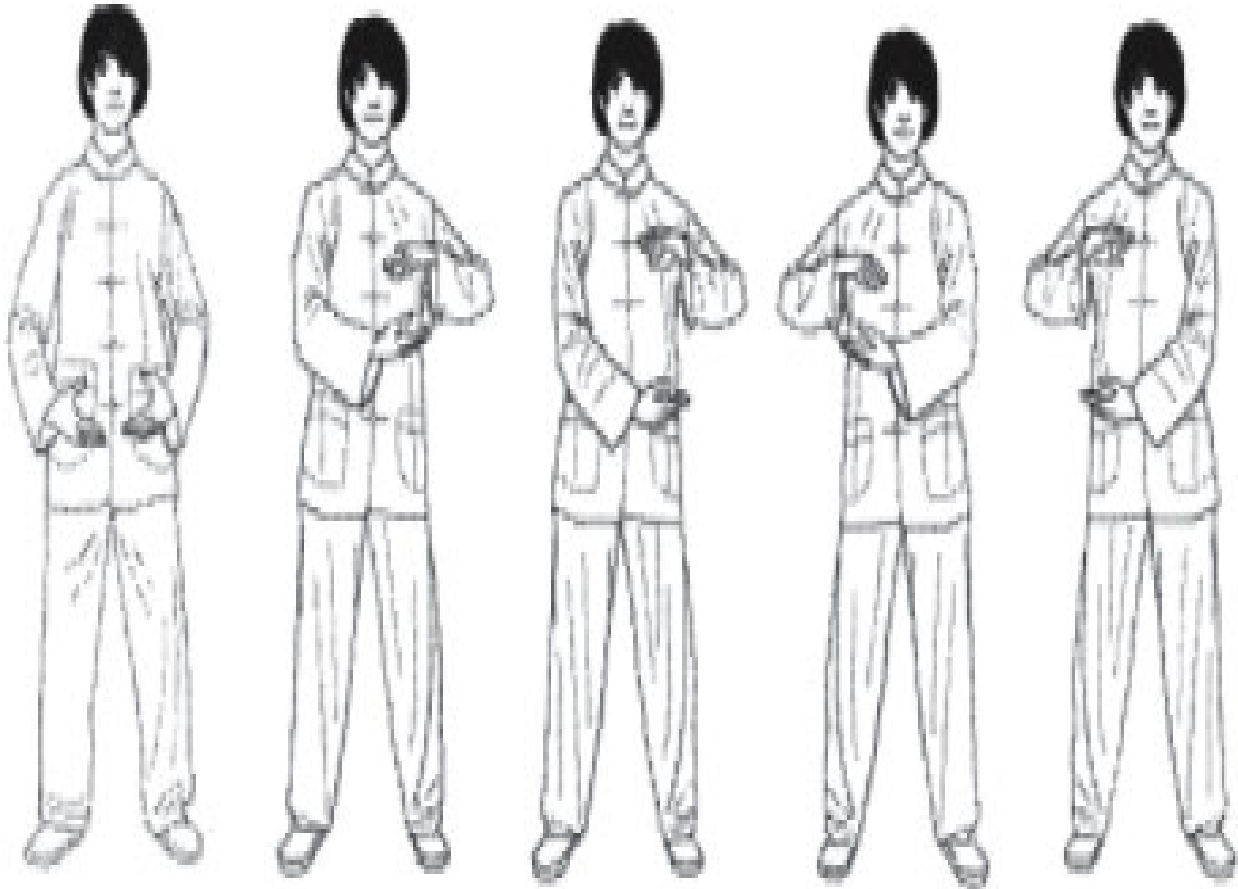
ব্যায়াম সম্পূর্ণ করা:

পৃথিবীর অবস্থান থেকে শুরু করুন।হাতের তালু দুটি নিচে রাখুন এবং শ্বাস নেওয়ার সময় নিজের হাত দুটি কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যান।

শ্বাসবায়ু ছাড়তে ছাড়তে নিজের হাত দুটি ছাড়ুন এবং বু ক্কি অবস্থায় আসুন।

ব্যায়াম সম্পূর্ণ করা:
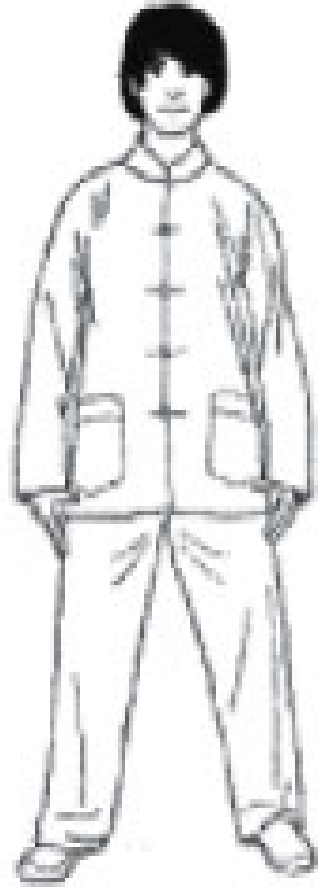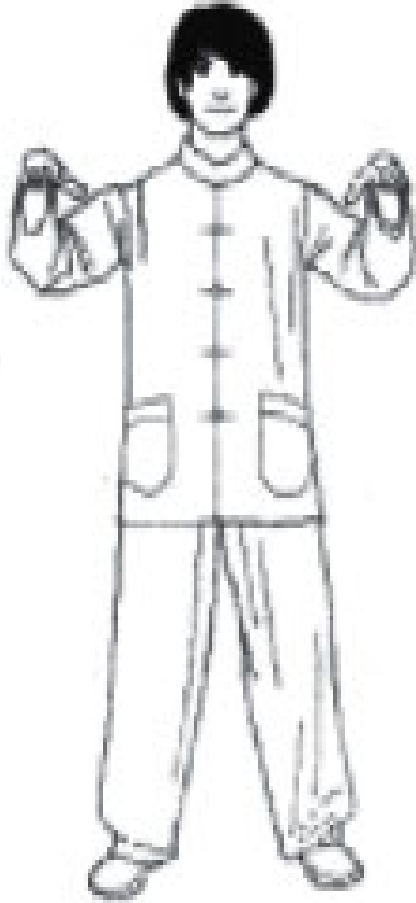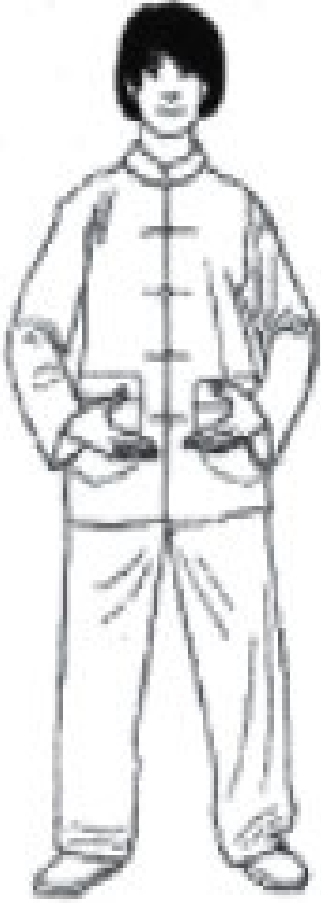
শিএৎসু

হাতের বুড়ো আঙ্গুল এবং হাতের তালুর মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে যে উর্জার সৃষ্টি হয় তার সাহায্যে কাজ করার এই পদ্ধতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জাপানে গড়ে উঠেছিল।সাধারণত যারা বাতের ব্যাথায় কষ্ট পান তাদের জন্য এর ব্যবহার করা হত।শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে শ্বসন ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

ব্যায়ামের যেকোনও প্রকারভেদ একই রকম করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এর পিছনের উদ্দেশ্য বুঝে শরীরের গতিবিধি সঠিক রাখাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।এর পিছনে শরীরকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, যা সফল হওয়া বাঞ্চনীয়।তাউ ইন বলতে যেকোনও একটা গতিবিধি বোঝায় না।শরীরকে সংকচিত করা, ঘাড় ওঠানো, হাঁটা, শোয়া, দাঁড়ানো বা কোনও এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা, এই সবই তাও ইন।

- গে হোঙ্গ:

ভালো করে শ্বাস নিন ও দীর্ঘ দিন জীবিত থাকুন

মন ও শরীর বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সংগ্রহ করুন, ঝিঝুন শিশু।এই পুস্তক ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে সৈনিক চিকিৎসক ও লেখক সন সিমিও এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন।এতে ধ্বনি ও গতিবিধির মাধ্যমে ছয়টি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে হৃদয় শান্ত করার চেষ্টা করা হয়।

ছয়টা আওয়াজ:

শ্লু-শ এই ধরনের উচ্চারিত ধ্বনি যকৃতের জন্য খুবই উপযোগী।

হি-হর, এই ধরনের উচ্চারিত ধ্বনি হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত।

সি-সর, এই ধরনের উচ্চারিত ধ্বনি ফুসফুসের সাথে সম্পর্কিত।

চুই-চবি, যে ধ্বনি শুনতে এই রকম লাগে তা যকৃতের সাথে সম্পর্কিত।

হু-হু, যে ধ্বনি শুনতে এই রকম লাগে তা প্লীহার সাথে সম্পর্কিত।

কসি-শি যে ধ্বনি শুনতে এই রকম লাগে তা সম্পূর্ণ শরীরের সাথে সম্পর্কিত।

সন সিমিও একটা কবিতার মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিষয়টি বর্ণিত করেছেন, বিভিন্ন ঋতুতে এই ধ্বনি গুলির সাহায্যে কীভাবে একটা সুন্দর জীবন অতিবাহিত করা যায়, তিনি সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায়।এই কবিতায় এটাও বলা আছে যে, আপনি যখন কোনও ধ্বনি নির্গত করবেন তখন আপনার কোন অঙ্গের কথা ভাবা উচিত।

বসন্ততে 'শ্লু' বলে নিজের চোখ দুটি জলে ভরুন,

তাতে করে 'বুড' আপনার যকৃৎ ঠিক করে দেবে।

গরমে 'হি' -এর লাভ নিন,

তাহলে নিজের হৃদয় সুস্থ রাখতে পারবেন।

বর্ষার সময় 'সি'-এর ব্যবহার করুন,

তাহলে আপনার ফুসফুস সাহায্য পাবে।

'চুই'-এর সাহায্যে যকৃতের সঙ্গ দিন,

তাতে করে শরীর মধ্যস্থ জলস্তর শান্ত হবে।

'কসি'-র সাহায্যে গরমকে কাবু করুন

আর যেকোন ঋতুতেই দীর্ঘ শ্বাস নিতে ভুলবেন না, যা আপনার খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

এত আস্তে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করুন, যাতে আপনার কান পর্যন্ত সেই আওয়াজ না পৌঁছায়।

আর এই সমস্ত কিছু প্রাপ্ত করার জন্য 'সরাব'-তন্ত্রের ব্যবহার করুন।এটা সুখী ও সুস্থ জীবনের মন্ত্র।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত সংস্কৃতি গুলি বোঝা হয়তো এতটা সহজ হবেনা।কিন্তু আপনি যদি এতে বর্ণিত সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে একটা সুতোর সন্ধান করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্বাস ও গতির সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে।যখন আমরা নিজেদের শরীর ও শ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করি, তখন আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভুলে শুধু বর্তমান নিয়েই বেঁচে থাকি। সবচেয়ে বড়ো লাভ হল, আপনি শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময় সজাগ হয়ে যান।

৯

দৃঢ়তা ও বাবি-সাবি

চিন্তা ও মানসিক চাপ আপনার শরীরের উপর কোনও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না অথচ আপনি সমস্ত রকম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, কীভাবে এমনটা হতে পারে?

দৃঢ়তার অর্থ কী?

যাদের কাছে 'ইকিগাই' স্পষ্ট, তাদের মধ্যে একটা বিষয় সমান ভাবে দেখা যায়। তারা নিজেদের 'ইকিগাই' পূরণ করার জন্য যা খুশি করতে পারে।যদি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়, তবুও তারা যেকোনও সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু কোন মতেই তারা নিজেদের 'ইকিগাই' ত্যাগ করেনা।মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা 'দৃঢ়তা' বলতে যা বোঝেন, আমরা এবার সেটা বুঝবো।

'দৃঢ়তা' মানে কোনও একটা কাজের পিছনে আদা-জল খেয়ে পড়ে যাওয়া নয়। এখানে আমরা 'দৃঢ়তা'র বাস্তবিক অর্থ কী তা বোঝার চেষ্টা করবো।এখানে আমরা পৃথিবী-কে একটা আলাদা দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, 'শীঘ্রই কী করতে হবে' তার থেকে বেশি 'কোনটা করা জরুরি' সেই দিকেই ধ্যান দেওয়া হয়।সেই সাথে মানুষের ভেতরে নেগেটিভ চিন্তার জন্ম হয়না।দৃঢ়তা-কে টপকে কীভাবে কঠোরতা গড়ে তুলতে হবে, সেটা জানাটা খুবই জরুরি।

আজ নয়তো কাল, আমাদের জীবনে কঠিন পরিস্থিতি আসবেই।আমরা কীভাবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো, তার উপর বহু কিছু নির্ভর করে।আমাদের শরীর, মন ও আবেগগুলি কতটা দৃঢ় হওয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করেছে, তার উপরেই নির্ভর করে আপনি যেকোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন কীভাবে? একটা জাপানি প্রবাদ আছে,

'নানা কোরোবি ইয়া ওকি'- সাত বার পড়ে, আট বার ওঠে'।

সমস্যার মোকাবিলা করাই আমাদের ক্ষমতা অর্থাৎ আমাদের দৃঢ়তা।আমরা যত শীঘ্র দৃঢ়তার সাথে সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি তার

থেকে বাইরে বেরিয়ে একটা অর্থপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ পাবো। যাদের মধ্যে দৃঢ়তা থাকে তারা কোনও দিন নিরাশার শিকার হয়না, আমাদের সর্বদা লক্ষ্যের দিকে ধ্যান দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা উচিত।দৃঢ়তাই হল এর শক্তি।সমানে কোনও কঠিন পরিস্থিতি উপস্থিত হলে কীভাবে তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি করে নির্গত হতে হয়, সে জ্ঞান তাদের আছে। যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেই দিকে তারা নজর রাখে,কিন্তু যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, সেই বিষয় গুলি নিয়ে তারা ব্যর্থ চিন্তা করেনা।

রেনহোল্ড নিবুহর শান্তির জন্য যে প্রার্থনার রচনা করেছিলেন তা খুবই জনপ্রিয়, নিম্নে তা দেওয়া হল:

হে ভগবান! যে জিনিস গুলি আমরা বদলাতে পারবোনা,

সেগুলি স্বীকার করার শান্তি দাও।

যে বিষয় গুলি বদলানো উচিত

সেই গুলি বদলানোর সাহস দাও।

আর ওপরে দেওয়া দুটি বিষয়ের

পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দাও।

বৌদ্ধ ধর্ম ও স্টোইসিজম-এর মাধ্যমে আবেগাত্মক দৃঢ়তা:

নেপালের কপিলাবস্তু শহরের রাজপুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ)।শৈশব থেকে যৌবনের প্রথমার্ধ মহলেই কাটিয়েছিলেন তিনি, চারদিকে ছিল সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাচুর্যের বাস। ১৩ বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়।তারপর তিনি এক পুত্রের পিতা হন।

কিন্তু কিছুতেই যেন সংসারে মন বসাতে পারছিলেন না তিনি, শেষ পর্যন্ত ২৯ বছর বয়সে সংসার, রাজপাট ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন তিনি। কিন্তু সেই বৈরাগ্যের মধ্যেও তিনি আনন্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।যে আনন্দের সন্ধানে তিনি রাজ মহল, রাজপাট ত্যাগ করেছিলেন, সেই আনন্দ যেন কিছুতেই তাঁকে ধরা দিচ্ছিলো না। তখন উনি বুঝতে পারেন যে, দুটি ভূমিকাই ভুল।সংসারের মধ্যে থেকে মানুষের সমস্ত কিছু ভোগ করা উচিত, সেই সাথে এই জাগতিক বস্তুর মোহ যেকোনও সময় ত্যাগ করার মতো দৃঢ়তা থাকতে হবে।

জৈনরা সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে এর অভ্যাস শুরু করেছিলেন।এই সন্ন্যাসীরা সংসারের সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে সক্ষম হন, তাঁদের শরীরে থাকা কাপড়টুকুই তাঁদের একমাত্র সম্পত্তি।কিন্তু এই বৈরাগ্য জৈনদের পছন্দ হয়না, তাঁরা স্টোইসিজমেরে অভ্যাস করতে শুরু করেন, এতে বলা হয়, এই জগতে সাংসারিক আনন্দ নেওয়াতে ভুল কিছুই নেই।যতক্ষণ না আপনি তার দাসে পরিণত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। যেকোনও মুহূর্তে এই সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তার জন্যও আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।যদি আপনি তা রপ্ত করতে পারেন, তাহলে বুঝবেন আপনি দাসত্ববোধের থেকে রেহাই পেয়েছেন।

সন্ন্যাসীদের মতো সমস্ত জাগতিক বস্তুর ত্যাগ করাটা আপনার লক্ষ্য নয়, বরং এই বস্তু আপনার ভেতরে যে নেগেটিভিটির জন্ম দেয়, তাকে জয় করাই আপনার একমাত্র লক্ষ্য।

এই ভাবনাকে জয় করা বৌদ্ধধর্ম বা স্টোইসিজম'র মুখ্য উদ্দেশ্য।এই দুটি পথ আলাদা ঠিকই কিন্তু তা মানুষের নেগেটিভিটি ও অহংকার ক্ষুণ্ন করার কাজ করে।বৌদ্ধধর্ম ও স্টোইসিজম-এ সুন্দর জীবন শৈলীর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।স্টোইসিজম-এর মতে সুখ ও ইচ্ছা সমস্যা নয়।আমরা যদি তার দাস না হই তাহলে তার উপভোগ করতে কোনও সমস্যা নেই।যেকোনও পরিস্থিতিতে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করাই স্টোইকের গুণধর্ম বলে মানা হয়।

খারাপ থেকে খারাপতর কী হতে পারে?

আমরা নিজেদের পছন্দানুসারে চাকরি পাই, কিন্তু কিছুদিন বাদে আমরা পুনরায় নতুন চাকরির সন্ধান শুরু করি।হঠাৎ-ই লটারিতে কিছু টাকা জিতে আমরা গাড়ি কিনে নিই, কিন্তু কিছুদিন বাদে আমাদের মনে হয়, আমাদের কাছে একটা বিলাসবহুল নৌকা থাকা উচিত ছিল।আমরা যা চাই তা পাওয়ার পর, আমাদের মনে নতুন ইচ্ছার সঞ্চার ঘটে, আর এই কারণেই মানুষ কোনও দিন সন্তুষ্ট হতে পারেনা।

স্টোইকরা মনে করেন, ইচ্ছা ও আকাঙ্খার পিছনে দৌড়ানোর কোনও মানে নেই। যাদের ভেতরে সদগুণ থাকে তাদের উদ্দেশ্য হল,"নিশ্চল ও স্থিরচিত্ত অবস্থা প্রাপ্ত করা।" অর্থাৎ এমন একটা অবস্থা যার মধ্যে ক্রোধ, লোভ, ভয়, চিন্তা ও আবেগের কোনও জায়গা থাকবেনা। শুধুমাত্র আনন্দ, প্রেম, শান্তি ও ধন্যবাদের ভাবনা থাকবে।

স্টোইকরা এই ধরনের গুণ প্রাপ্ত করার জন্য নেগেটিভ কল্পনা চিত্রের প্রয়োগ করেন।তাঁরা ভাবেন যে, তাঁদের কাছে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে হঠাৎ করে যদি তা হারিয়ে যায় বা তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? এইভাবে তাঁরা 'খারাপ থেকে খারাপতর কী কী হতে পারে', আগে থেকেই ভেবে নেন আর সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

নেগেটিভ কল্পনা করার সময় আমাদের ঘটনা নিয়ে ভাবতে হবে, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তায় পড়লে চলবেনা।

সেনেকা মানের এক ধনী ব্যক্তি রোমে থাকতেন।তাঁর কাছে সমস্ত রকমের সুখ-সুবিধা ছিল, তিনি স্টোইকের অভ্যাসও করতেন।প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে তিনি ভাবতেন, খারাপ থেকে খারাপতর কী কী হতে পারে।তিনি যে শুধু কল্পনা করতেন তাই নয়, তিনি তার প্রয়োগও করতেন।তিনি এক সপ্তাহ কোনও রকম চাকর-বাকর ছাড়া থাকার অভ্যাস করেন।সেই সঙ্গে ভালো খাবার বা পানীয় থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করেন।তাতে করে 'খারাপ থেকে খারাপতর' কী কী হতে পারে তিনি তা বুঝে যান ও সব সময়ের জন্য সেই চিন্তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

উচ্চতর ভাবনার জন্য ধ্যান আবশ্যক:

শান্তির জন্য প্রার্থনার সময় আমরা দেখেছি, নেগেটিভ পরিস্থিতির কল্পনা করার সাথে সাথে আরও একটা বিষয় ক্রমাগত করে গিয়েছে, যে বিষয় গুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেই বিষয়টাও বুঝতে হবে।

যে বিষয় গুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই, সেই বিষয়ে ভেবে আমাদের কোনও লাভ নেই।আমরা কী কী বদলাতে পারি, আর কী কী পারিনা, সেই

বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হবে।এই তথ্যের সাহায্যে আমরা নেগেটিভ বিষয় গুলির থেকে দূরে থাকতে পারি।

এপিকটেটাস বলেছেন, আপনার সাথে কী ঘটছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সেই বিষয়টাকে কীভাবে নিচ্ছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জৈন, বৌদ্ধধর্ম মনে করে ইচ্ছা ও আকাঙ্খাগুলি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং তার থেকে মুক্তির পথ খোঁজাটা খুবই জরুরি।নিজের মনকে বিচারধারা থেকে মুক্ত করা নয়, বরং বিচারগুলিকে সাক্ষীর চোখে দেখতে হবে, তার সাথে প্রবাহিত হলে হবেনা, সেটাই ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য।এই ধরনের অভ্যাস করার ফলে আমরা নিজেদের মনকে ক্রোধ, নিরাশা এবং হিংসার বেগে ধাবিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি।

বৌদ্ধধর্মে আবেগগুলি দূর করার জন্য একটা মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়, "ওম মনি পদমে হুম'।এতে 'ওম' অহংকারকে নষ্ট করে দেয়। দ্বেষকে নষ্ট করে 'ম';'নি' অর্থাৎ সংযম। এর সাহায্যে ইচ্ছা গুলি জয় করা সম্ভব হয়। 'পদ' অর্থাৎ দ্বৈতের নাশ, 'মে' অর্থাৎ লোভের নাশ, আর 'হুম' অর্থাৎ অন্যের প্রতি যে নেগেটিভ বিচার আছে তার নাশ করা।

আজ এবং এখনই অস্থিরতা দূর করুন:

দৃঢ়তা প্রাপ্ত করার আরও একটা উপায় আছে, এক্ষেত্রে আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কোন কালে বাঁচতে চান।বৌদ্ধধর্ম বা স্টোইনিজম, দুটিতেই বলা হয় যে, বর্তমানই একমাত্র কাল যার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে।অতীত বা

ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা না করে বর্তমান নিয়ে বাঁচতে শিখুন, আর আপনার সামনে যা আছে তা নিয়ে বিচার করুন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুক থিচ হ্যাট হঁন বলেন, একটাই মুহূর্ত আপনি সঠিক ভাবে উপভোগ করতে সক্ষম, আর সেটা হল বর্তমান ক্ষণ।

বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকার সাথে সাথে স্টোইক্স নিজের আশেপাশের অস্থিরতা সম্পর্কেও সজাগ থাকে।

মার্কাস অরিলিয়স ছিলেন রোমের সম্রাট, আমরা যে জিনিস গুলিকে ভালোবাসি সেইগুলি গাছের পাতার মতো, একটু জোরে হাওয়া দিলেই তা ঝরে যেতে পারে। তিনি আরও বলেছেন আমাদের আশেপাশে যে ঘটনা গুলি ঘটে তা কোনও দুর্ঘটনার পরিণাম নয়, বরং সেটাকে বিশ্বের কাজ করার প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে।আমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, আমাদের আশেপাশে যা ঘটে বা আমাদের কাছে যা যা আছে, তা কোন না কোনও দিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সবই ক্ষণ স্থায়ী।যদি এই বিষয়টা মাথায় রাখি তাহলে কোনও কিছুর পিছনেই আমরা ছুটবো না।তাতে করে আপনি বর্তমান নিয়ে বাঁচার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন, আপনার কাছে যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন।

সেনেকা বলেছেন, এই বিশ্বের সমস্ত কিছু নশ্বর,ক্ষণস্থায়ী, অস্থির এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল এই জগৎ বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।যদি আপনি সর্বদা এই কথা গুলি মনে রাখতে পারেন, তাহলে তা হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আপনার কখনই দুঃখ হবেনা।

বাবি-সাবি এবং ইচিগো ইচিই:

ক্ষণস্থায়ী ও সর্বদা পরিবর্তনশীল এই প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য খোঁজার এই 'কলা' বাবি-সাবি, জাপানিরা মনে করেন পরিপূর্ণতার মধ্যে সৌন্দর্য খোঁজার চেয়ে অপূর্ণতার মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান করাই প্রকৃত কলা।এই কারণেই জাপানের মানুষরা এই ধরণের প্রবাদ গুলি সর্বদা ভাঙা কাপ বা অপূর্ণ বস্তুর মধ্যেই লিখে রাখে।অপূর্ণ, ক্ষণিক ও খুঁদ যুক্ত বস্তুর মধ্যে আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, কারণ এটাই প্রকৃতির আসল রূপ।

এই চিন্তাধারাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য জাপানিরা আরও একটা বিষয়ের ওপর জোর দেন, তাহল 'ইচিগো ইচিই'।যার অর্থ হল, বর্তমান ক্ষণই প্রকৃত সময়, যা একবার চলে গেলে আর কখনও ফিরে আসেনা।যেকোনও সামাজিক সম্মেলন, সমারোহ এবং অনুষ্ঠানে জেনে বুঝে এই পংক্তির ব্যবহার করা হয়, একে অপরকে এটা বোঝনোর চেষ্টা করা হয় যে, অতীতের সমস্যা নিয়ে না ভেবে বর্তমান মুহূর্তকে আনন্দের সাথে যাপন করার চেষ্টা করুন।

সবাই যখন চা খাওয়ার জন্য একসাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখন জৈন মেডিটেশন ও জাপানের মার্শাল আর্ট নিয়ে কথা বলা হয়, এই তিনের সাহায্যে বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকার বিষয়েই জোর দেওয়া হয়।

পশ্চিমের দেশগুলিতে বহু যুগ আগের বাড়ি-ঘর বা শত বছর প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য দেখার পর আমাদের মনে হয় যেন কিছুই বদলায় না।রোমান আর্কিটেক্ট গ্রেসো নিজের অসাধারণ কার্য-কুশলতার জন্য পৃথিবী বিখ্যাত।তাঁর তৈরি দুটি জিনিস হুবহু একই রকম, তাঁর নির্মাণ কুশলতার জোরে তা যুগের পর যুগ ধরে একই রকম রয়ে গিয়েছে, এই সমস্ত কিছুর জন্যই তিনি জনপ্রিয়।

জাপানি আর্কিটেক্ট কখনই সর্বোত্তমের জন্যে আগ্রহী নন, তাঁরা চৈতন্য এবং বাবি-সাবি-র ভিত্তিতে কাজ করেন।সেখানকার বড়ো বড়ো ইমারতও কাঠের তৈরি।ইমারত তৈরির সময় তাঁরা যে বিষয়টা মাথায় রাখেন, তাহল ওই ইমারত সর্বকালের জন্য বানানো হচ্ছে না,বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও যাতে তা গড়ার সুযোগ পায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।মানুষের জীবন ও তার তৈরি জিনিস দুটিই ক্ষণস্থায়ী আর জাপানি সংস্কৃতি এটাকেই মান্যতা দিয়েছে।

প্রতি কুড়ি বছর বাদে দ্যা গ্র্যান্ড শ্রিন অফ পুনরায় বাঁধা হয়।যুগের পর যুগ ধরে একটাই জিনিস চলবে, এমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে জাপানিরা কিছুই বানায় না, বরং নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি জোর দেন।বংশ পরম্পরায় টিঁকে থাকা কোনও বস্তুর চেয়ে মানুষের তৈরি কোনও বস্তু যদি ক্ষণস্থায়ীও হয় তাহলেও তা অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতেই হবে যে, কিছু কিছু জিনিসের ওপর আমাদের কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ থাকে না।যেমন ধরুন সময় ও আমাদের আশেপাশের ক্ষণস্থায়ী জিনিস।

ইচিগো ইচিই আমাদের বর্তমান নিয়ে থাকার ও সামনে আগত মুহূর্ত যাতে আমরা খুশির সাথে অতিবাহিত করতে পারি তার জন্য প্রেরণা দেয়।তাতে করে আমরা নিজেদের 'ইকিগাই' খোঁজার এবং সেই অনুসারে কাজ করার সুযোগ পাই।বাবি-সাবি আমাদের অপূর্ণতার মধ্যে বিকাশের সুযোগ খুঁজতে সাহায্য করে।

নমনীয়তার ওপরে কঠোরতা:

এক পৌরাণিক ঘটনায় বলা হয়েছে, হরযুলস যখন হায়ড্রা নামক রাক্ষসের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন তখন একই স্থানে দুটি মাথা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।তখন তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, আমি কখনই এই রাক্ষসকে মেরে শেষ করতে পারবো না।

নাসিম নিকোলাসের কথায় কঠোরতার বিষয়ে স্পষ্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করা আছে।কঠোরতার অর্থ 'বিকৃতির মধ্যে দিয়ে প্রস্তুত জিনিস'।জীবনের পরিভাষা অনুসারে আমরা বলতে পারি, এমন প্রাণী, মানুষ, গাছ বা বস্তু যাদের আঘাত করার পর তা দুর্বল হয়ে যায় তাকে আমরা ক্ষণভঙ্গুর বলি, কিন্তু যে বা যারা প্রতিকার করতে পারে, আর শত সমস্যার মধ্যেও টিঁকে থাকে তাকে দৃঢ় বা কঠোর বলা হয়।কিন্তু যে বস্তু গুলি খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর পুনরায় নতুন করে গজিয়ে ওঠে তাদের প্রতিজৈবিক বা এণ্টিবায়টিক বলা হয়।

হায়ড্রা-র কাছে এক অদ্ভুত শক্তি ছিল।গল্পে বলা আছে, যখনই তার উপর কোনও হামলা হত তখনই সে আরও দৃঢ়তা নিয়ে ফিরে আসতো, আরও নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতো ও নিজের মূল স্থানে ফিরে আসতো। এণ্টিবায়টিক বা প্রতিজৈবিক বলতে বোঝায় যার উপর হামলা হওয়ার পর তা আগের থেকেও বেশি প্রতিভা সম্পন্ন হয়ে উঠতো।

বিশেষ কিছু পরিস্থিতি বা বিপদের সময় এই এণ্টিবায়টিক বা প্রতিজৈবিক দেখা যায়।২০১১ সালে জাপানের তোহোকু এলাকায় সুনামি এসেছিল, যার দাপটে ফুকুশিমার মতো সাগরের কিনারায় অবস্থিত বহু গ্রাম খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।এই ঘটনার প্রায় দুই বছর বাদে আমরা সেই এলাকায় গিয়েছিলাম, সেখানে রাস্তার দুই ধারে বহু নির্জন গ্রাম চোখে পড়ে।সেখানকার রাস্তা গুলি যেন হারিয়ে গিয়েছিল, ঘর-বাড়ি-র মধ্যে একটা পুতুল পর্যন্ত পড়েছিলনা।সেখানকার পেট্রল পাম্প গুলি ধু-ধু করছিল, রেল স্টেশন গুলি বন্ধ পড়েছিল।সরকার সেখানকার গ্রাম গুলির কথা ভুলেই গিয়েছে, তাই তা নতুন করে গড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

ইশিনোমাকি ও কেসেনুমারও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তা আবার নিজের পুরানো রূপ ফিরে পায়।পুনরায় নিজেদের আগের রূপ ফিরে পাওয়া ইশিনোমাকি ও কেসেনুমা নিজেদের দৃঢ়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

যে ভূমিকম্পের কারণে সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল তা সর্বাধিক বড়ো আঘাত সৃষ্টি করেছিল ফুকুশিমা নিউক্লিয়ার প্লান্টে।টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কম্পানি-রও খুবই ক্ষতি হয়েছিল।সেই কম্পানি ও সেখানকার ইঞ্জিনিয়াররা ওই আঘাত কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না, তাই বিগত দশ বছরে এই কম্পানি আর কিছুতেই নিজের পুরানো জায়গায় ফিরতে পারেনি।এই বিপদের সময় একটা কথাই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, ওই কম্পানি কতটা দুর্বল ছিল।

ভূমিকম্পের পর কিছু দিনের মধ্যেই জাপানি স্টক মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়।তারপর কোন কম্পানির শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায়? সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে. যে কম্পানি নির্মাণ কার্যে এগিয়ে আসে. যা ওই ডুবে যাওয়া গ্রামকে পুনরায় গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে সেই কম্পানি এবং তার শেয়ারের দামই বৃদ্ধি পেয়েছিল।এই কম্পানিগুলি প্রতিজৈবিক হওয়ার প্রমাণ দেয়, কারণ সমস্যা দেখেই সেই গুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এবার দেখুন এই তথ্য গুলির সাহায্যে আমরা কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে লাভবান হতে পারি:

১. একটাই স্রোতের উপর নির্ভর করবেননা:

কখনই একটাই স্রোতের উপর নির্ভর করে জীবন কাটাবেননা। নিজের বর্তমান কুশলতার সাথে আরও কিছু কলা শেখার চেষ্টা করুন।এর ফলে, এখন আপনি যে কাজের সাথে যুক্ত যদি সেই কাজে কোনও রকম বাধার সৃষ্টি হয়, যদি সেই কাজ তেমন লাভজনক বলে মনে না হয় তাহলে আপনি তা ত্যাগ করে দ্বিতীয় বিকল্পের কথা ভাবতে পারেন।

আমরা ওগিমি-তে যাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাদের প্রত্যেকের কাছেই অর্থোপার্জনের একাধিক রাস্তা ছিল।তারা নিজেদের হাতের তৈরি জিনিস বাজারে বিক্রি করতো, সেই সাথে নিজেদের বাগানে যে সমস্ত শাক-সবজির ফলন হতো, সেই গুলিও বাজারে বিক্রি করতো।একটা প্রবাদ সর্বদা মাথায় রাখবেন, সমস্ত ডিম কখনই এক বাক্সে রাখবেন না।

আপনার হয়তো মনে হতেই পারে যে, আপনি অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী, আপনার কাজ এতটাই মহান যে আপনার আর দ্বিতীয় কাজ শেখার কোনও প্রয়োজনই নেই।কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই দক্ষতা পুরানো হয়ে গিয়ে তা হারিয়ে যেতে পারে।সর্বদা যদি নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারেন তাহলে আপনাকে কখনই কাউর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবেনা।কিন্তু মানুষ নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে চায় এবং নিজেদের আরামদায়ক গণ্ডীর বাইরে বেরোতে চায়না।

২. ছোট ছোট বিপদের ঝুঁকি নিন:

অর্থব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, সেটা বুঝতে পারলে এই বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।মনে করুন আপনার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে।তার মধ্যে ৯০০০০ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে বাকি ১০০০০ টাকা বিভিন্ন কম্পানিতে নিয়োগ করেন। প্রতিটি কম্পানিতে ১০০০ টাকা করে নিয়োগ করেছেন। এবার ধরুন তার মধ্যে তিনটি কম্পানি সম্পূর্ণ রূপে বিফল হয়ে গিয়েছে, যার ফলে আপনার ৩০০০ টাকা ডুবে গিয়েছে।

তিনটি কম্পানির খানিকটা ক্ষতি হওয়ার জন্য আপনারও ১০০০-২০০০ টাকা ক্ষতি হয়ে যায়।কিন্তু তিনটি কম্পানির সামান্য লাভ হওয়ার জন্য আপনিও ১০০০-২০০০ টাকা লাভের মুখ দেখেছেন।একটা কম্পানি খুবই বিরাট আকার ধারণ করে, যাতে করে শেয়ারের দাম ২০ গুন বৃদ্ধি পায়।সেখান থেকে আপনি ২০০০ টাকা পান।অর্থাৎ বাকি কম্পানি গুলিতে ক্ষতি হয় সত্ত্বেও আপনি লাভের মুখ দেখতে পান। অর্থাৎ আপনিও হায়ড্রা-র মতো এন্টিবায়োটিক হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এন্টিবায়োটিক হওয়ার জন্য আপনাকে ছোট ছোট বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে।সংবাদ পত্রে কোনও কম্পানির নাম পড়লেন আর তাতে এক লক্ষ টাকা নিবেশ করে দিলেন, এটা কিন্তু বড়ো বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার সমান।

৩. যা আপনাকে দুর্বল করে তোলে, তার থেকে দূরে থাকুন:

এর জন্য আমাদের নেগেটিভ বিচারের সাহায্য নিতে হবে।কোন জিনিসটা আপনাকে দুর্বল করে দেয়, তা নিজেকেই জিজ্ঞাসা করুন।কোনও ব্যক্তি বা অভ্যাসের জন্য কি আপনি বিপদের গন্ধ পান?

আমরা যখন নতুন বছরের লক্ষ্য গড়ে তুলি তখন অনেক বড়ো বড়ো লক্ষ্যের কথা ভাবি।কিন্তু তা না করে যদি বিশ্বাসের সাথে ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করি, তাহলে তা অনেক বেশি লাভজনক বলে প্রমাণিত হবে।এই ছোট ছোট লক্ষ্য গুলি এইরূপ হতে পারে:

দুইবার খাওয়ার মধ্যে কোনও জলখাবার খাবো না।

সপ্তাহে একবার মিষ্টি জাতীয় খাবার খাবো।

বার-বার অল্প অল্প করে নিজের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেব।

কু-সঙ্গ ত্যাগ করবো।

শুধুমাত্র প্রয়োজনের কথা ভেবেই কাজ করবোনা না, বরং নিজের পছন্দের কাজ করার চেষ্টা করবো।

সারাদিনে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় ফেসবুকে থাকবো না।

জীবনে দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য ভয়কে পরাজিত করাটা খুবই জরুরি। যেকোনও সমস্যাকে নতুন সুযোগ বলে ভাবুন ও সেদিকে তাকান।আপনি যদি নিজের মধ্যে এন্টিবায়োটিক গড়ে তুলতে পারেন তাহলে যেকোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং অবশ্যই নিজের 'ইকিগাই' পূরণ করতে সফল হবেন।বাবি-সাবি বলে জীবনে দোষ তো থাকবেই, ভুল ছাড়া জীবন হয়না। দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাওয়া সময় আমাদের এটাই বলে দেয় যে, এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু যদি আপনার কাছে নিজের 'ইকিগাই' স্পষ্ট থাকে তাহলে এই বর্তমান মুহূর্তেও আপনি অনন্তের সম্ভাবনা খুঁজে পাবেন।

সারাংশ:

ইকিগাই: জীবন যাপনের কলা

ইকিগাই: জীবন যাপনের কলা

বিংশ শতাব্দীতে মিৎসুও আইডা নামের এক বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার এবং কবি ছিলেন।'ইকিগাই'-এর জন্য যারা নিজেদের সারাটা জীবন দিতে রাজি ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।শ্যাডো ক্যালিগ্রাফি ব্রাশ'র সাহায্যে তিনি অজস্র কবিতা লেখেন এবং নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

তাঁর রচিত বেশিরভাগ কবিতার মধ্যেই বর্তমান ক্ষণের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। নিম্নে যে কবিতা দেওয়া হয়েছে এখানে তার ভাবানুবাদ দেওয়া হল, যার অর্থ হল এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে যদি কিছু থাকে তাহল তোমার অস্তিত্ব।

আর একটা কবিতায় বলা আছে, 'আজ, এখন, বর্তমান-এ বাঁচুন।'এই কবিতা থেকে কবি বোঝাতে চেয়েছেন এই বিশ্বে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়।(মন থেকে তা মেনে নিলে আমাদের সমস্ত নিরাশা নষ্ট হয়ে যায়।)
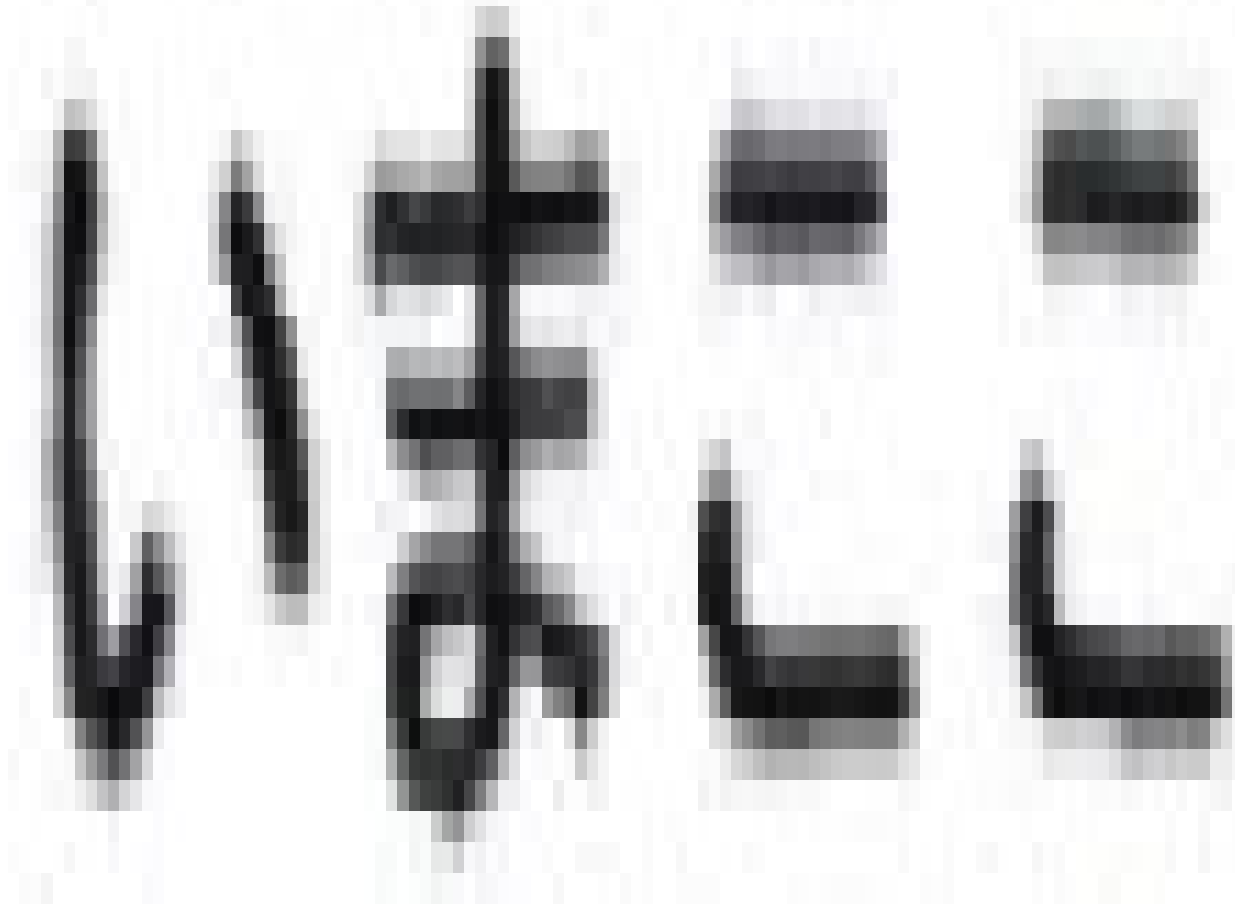
নিম্নে প্রদেয় কবিতায় তিনি 'ইকিগাই'-এর মুখ্য রহস্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আনন্দ সর্বদা আপনার হৃদয়েই থাকে।

তিনি নিজের আর একটা কবিতায় বলেছেন, কখনও না থেমে এগিয়ে যাও।

একবার যদি আপনি নিজের 'ইকিগাই' খুঁজে নিতে পারেন তাহলে সেদিকে ধ্যান দিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে পারলেই জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাবেন।একবার যদি আপনি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝে যান, তাহলে সর্বদা ফ্লো-তে থেকে আপনি নিজের জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।যেমনটা ক্যালিগ্রাফার ক্যানভাসে কাজ করার সময় খুঁজে পায়, এবং ৫০ বছর ধরে সুশি রান্না করলেও প্রতিবার রাঁধুনি নতুন করে রোমাঞ্চ বোধ করে।সে আজও নিজের গ্রাহকদের জন্য নিজের আনন্দেই সুশি বানায়।

উপসংহার:

আমরা মানুষ, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের 'ইকিগাই' ভিন্ন রকম, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জীবনের অর্থ খুঁজতে থাকি।যখন আমরা নিজেদের 'ইকিগাই'-এর সাথে যুক্ত হতে পারি তখন আমাদের কাছে জীবন অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় এবং কাজ আমাদের আনন্দ দিতে শুরু করে।যখন আমাদের 'ইকিগাই'-এর সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়,তখন আমাদের কাছে জীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে।

আধুনিক জীবন আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত স্বভাব থেকে দূরে নিয়ে যায়। পয়সা, ক্ষমতা ও পদোন্নতি আমাদের মূল স্বভাবের থেকে দূরে নিয়ে যায়।এই তিনটি জিনিসকে কখনই নিজের জীবনে চেপে বসতে দেবেননা। আমাদের ভেতরে যে উৎসুকতা এবং ইন্টিউশন আছে তাকে দিক নির্ধারণ যন্ত্রের মতো ব্যবহার করুন, তাই আমাদেরকে 'ইকিগাই' পর্যন্ত নিয়ে যাবে।তার থেকে লাভবান হন এবং নিজের প্রকৃত আনন্দ পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। যা পছন্দ হয়না, তার থেকে দূরে থাকুন। নিজের ভেতরের উৎসুকতাকে মরতে দেবেন না, কারণ সেটাই আপনার জীবনের আসল অর্থ খুঁজে বার করে।কোনও মহান কাজ করা জীবনের উদ্দেশ্য, এমনটা নাও হতে পারে।হয়তো ভালো বাবা-মা হওয়া বা নিজের প্রতিবেশীকে সাহায্য করাও আপনার জীবনের 'ইকিগাই' হতে পারে।

জীবন কোনও ধাঁধা নয়, যে আপনি তার উত্তর খুঁজে পাবেন।শুধুমাত্র এমন কিছু ভাবুন যার দ্বারা আপনি নিজের সবচেয়ে পছন্দের কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন, আর সেই কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকুন।যেকোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন যাতে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করতে পারেন।

ইকিগাই-এর দশটা নিয়ম:

ওগিমি-র লোকেদের দেখার পর ও তাদের সাথে কথা বলার পর আমরা 'ইকিগাই'-এর দশটা নিয়ম বুঝতে পেরেছি।তা বুঝিয়ে আমরা এই যাত্রা শেষ করতে চাই।

১. সর্বদা কাজের মধ্যে থাকুন, কখনও অবসরের কথা ভাববেন না:

যারা নিজেদের পছন্দের কাজ বন্ধ করে দেয়, তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে।তাই আপনার যা করতে ভালো লাগে তা করতে থাকুন।বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়া, অপরের কাজে লাগতে পারে এমন বস্তুর নির্মাণ করা এবং সেবানিবৃত্তির সময় এসে গেলেও বড়ো কিছু করার কথা ভাবতে থাকুন।

২. তাড়াহুড়ো করবেননা:

সর্বদা তাড়াহুড়ো করা আপনার দীর্ঘায়ুর জন্য প্রাণঘাতী বলে প্রমাণিত হতে পারে। একটা অতি প্রাচীন প্রবাদ আছে, ধীরে চললে বহুদূর যেতে পারবেন।আমরা যখন অকারণ তাড়াহুড়ো না করে কোনও কিছুকে বেরিয়ে যেতে দিই, তখন জানবেন নতুন সময় আপনার জীবনে নতুন কোনও অর্থ নিয়ে আসবে।

৩. পেট ভরে খাবেননা:

যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চান তাহলে কম খান।পেট ভরে না খেয়ে নিজের ক্ষমতার ৮০ শতাংশ খান।

৪. ভালো বন্ধু ও পরিবার:

বন্ধুর মতো ভালো ঔষধ আর কিছু হতে পারেনা।চিন্তার থেকে দূরে থাকার জন্য গল্প করুন, একে অপরের সাথে মন খুলে কথা বলুন।পরামর্শ দিন ও নিন। মজা করুন, স্বপ্ন দেখুন, মন খুলে জীবন উপভোগ করুন।

৫. পরের জন্মদিনের জন্য আরও বলশালী হয়ে উঠুন:

মনে রাখবেন যে জল প্রবাহিত হয় তাই স্বচ্ছ ও নির্মল থাকে, বদ্ধ জল পচে যায়। তেমনি যদি আপনি নিজের জীবন বলশালী ও দৃঢ় করে রাখতে পারেন তাহলে আপনার শরীরও দৃঢ় ও বলশালী থাকবে। তেমনি আপনি যদি বলশালী জীবন চান তাহলে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে হবে।ব্যায়ামের দ্বারা আমাদের শরীর আনন্দ লাভ করে এবং প্রয়োজনীয় হরমোনসও প্রস্তুত হতে থাকে।

৬. হাসি:

হাসি ও খুশি আপনাকে বন্ধু প্রদান করে।সেই সাথে শান্তিও পাওয়া যায়। ছোট ছোট জিনিসের থেকেও আনন্দ লাভ করা যায়। একটা কথা সর্বদা মাথায় রাখবেন, বর্তমান ক্ষণ বহু সম্ভাবনা নিয়ে আসে।

৭. প্রকৃতির সাথে যুক্ত থাকুন:

আজকের দিনে মানুষরা শহরে থাকে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার হিসাবেই আমাদের নির্মাণ করা হয়েছে।তাই মাঝে মাঝে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিন ও ব্যাটারি চার্জ করুন।

৮. ধন্যবাদ জানান:

আপনার যে পূর্বপুরুষ এই পৃথিবীকে আপনার জন্য বাস যোগ্য করে গেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানান।আপনার পরিবার ও বন্ধুদের সাহায্যে আপনার জীবন সুন্দর ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।তাদের সারা দিনে একবার ধন্যবাদ জানান।এতে করে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার খুশির সিন্দুক দিনে দিনে ভরে উঠেছে।

৯. বর্তমান নিয়ে বাঁচুন:

অতীত নিয়ে দুঃখ করা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিন।আমাদের কাছে শুধুমাত্র বর্তমান আছে।তার থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন এবং সেই মুহূর্তটা অবিস্মরণীয় করে তোলার চেষ্টা করুন।

১০. নিজের 'ইকিগাই' অনুসারে জীবন অতিবাহিত করুন:

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা প্রেরণা লুকিয়ে আছে।আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এমন বিশেষ কিছু থাকে যা আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রেরণা দিতে থাকে। আপনি যদি নিজের জীবনের 'ইকিগাই' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হন, তাহলে ভিক্টর ফ্রাংকলের হিসাবে 'ইকিগাই'-এর সন্ধানই আপনার 'ইকিগাই' হয়ে উঠুক।

আপনাদের প্রত্যেককে দীর্ঘ, আনন্দিত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের জন্য শুভকামনা।

-হেক্টর গার্সিয়া এবং ফ্রান্সিস মিরেলস

****